আলিবাবা ও চল্লিশ চোর

কুণ্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

Hard Copy & Scan - Abhishek De,
Edit Anirban Basu

SUBHAJIT KUNDU

আলিবাবা ও চল্লিশ চোর

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিবাবা ও চল্লিশ চোর

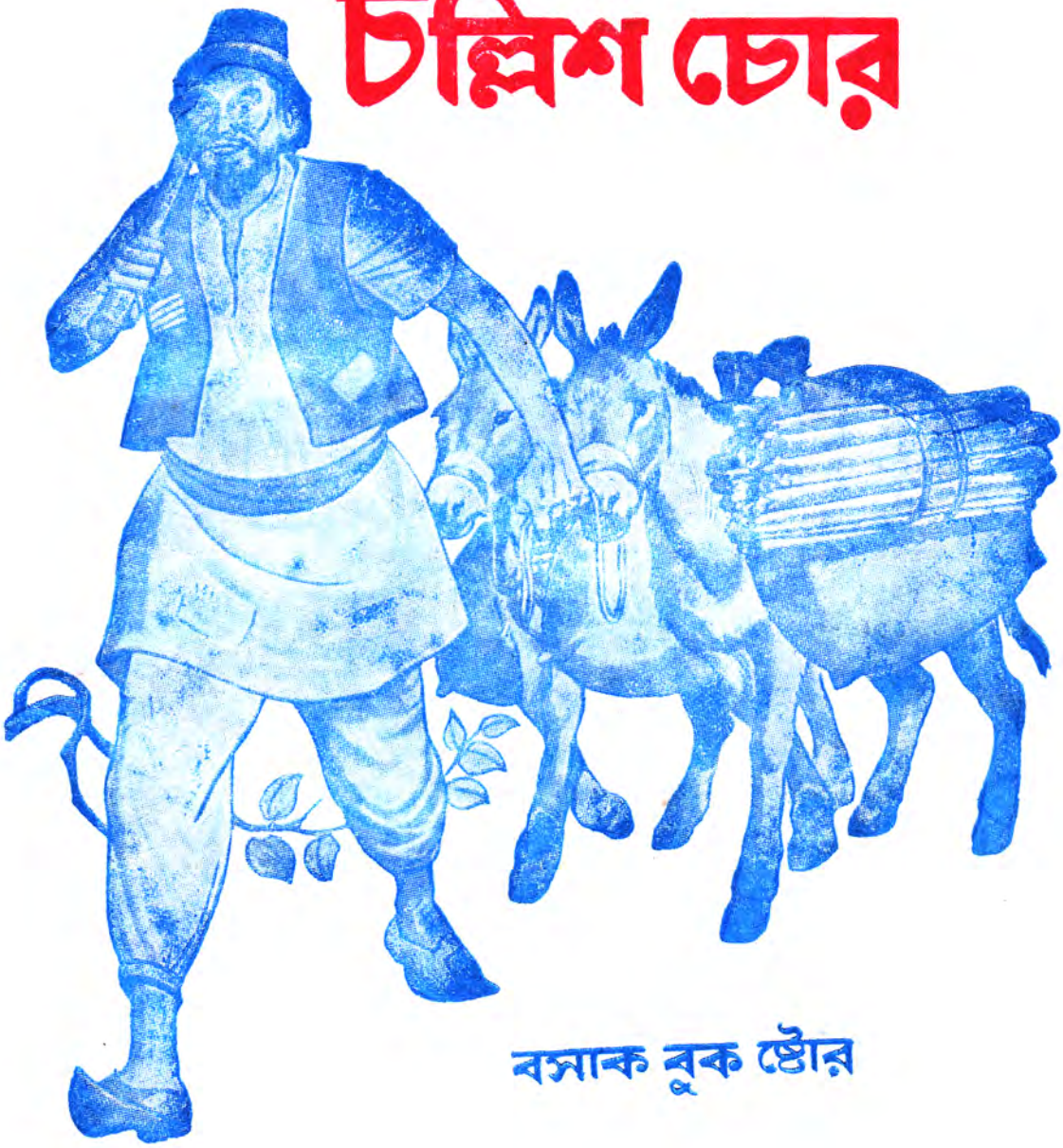

বসাক বুক ষ্টোর

উপহার

চতুর্থ সংস্করন, ১৩৮৭

প্রকাশক : বি. এন. বসাক
বসাক বুক ষ্টোর
৪, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ : নারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রক : সুরেন্দ্র নাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট.
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য—পাঁচ টাকা

আলিবাবা ও চল্লিশ চোর

ঠক্-ঠক্, ঠক্-ঠক্, ঠক্।

ও আবার কিসের শব্দ? কাঠ কাটার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ বাঘের হালুম-হালুম, ঐ কাঠ কাটার ঠক্-ঠক্-ঠক্, সবই হচ্ছে একটা খুব বড় বনে—একটা বড় জঙ্গলে।

ঐ শব্দ অনেক বছর আগেকার। এখনও ঐ শব্দ শোনা যাচ্ছে বারবার। ঐ বন-জঙ্গলটা কোথায়? ঐ বন-জঙ্গলটা ইরান দেশে বা পার্শিয়ায়। একটা পাহাড়ের একেবারে পাশে।

কাঠ কাটছে কে ?

কাঠ কাটছে আলিবাবা।

আলিবাবার আরো এক ভাই আছে। সেই ভাই তার বড় ভাই। নাম কাশিম। কাশিমের অনেক টাকা-কড়ি, আর বেশ ভাল ঘর-বাড়ি। তার বউ বড় মানুষের মেয়ে।

আলিবাবা বড়ই গরীব। সে বনে-বনে কাঠ কাটে। বাজারে সেই কাঠ বেচে। যা কিছু পায়, তাই দিয়ে কোন রকমে খেয়ে পরে প্রাণ বাঁচায়, দিন কাটায়।

আলিবাবা বনের ভেতরে কাঠ কাটছিল। সেই সময়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল,—দূরে খুব ধূলো উড়ছে। যেন কালো মেঘ আকাশে ঘুরছে। কি যে ব্যাপার, আলিবাবা কিছুই বুঝতে পারল না। সে আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। এইবার সে দেখল,—ঘোড়ায় চড়ে ঘোর বেগে একদল লোক আসছে। তাদের সবার হাতে তলোয়ার আর বর্শা।

সে খুবই ভয় পেল। তার সাথে ছিল তিনটা গাধা। তারা পশুদের দাদা। সে গাধা কয়টাকে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপর সে তাড়াতাড়ি করে খুব উঁচু একটা গাছের ওপর চড়ল। ডালপালার পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। চোখ রাখল সেই ঘোড়ায় চড়ে ঘোর বেগে আসা লোকগুলোর দিকে। ভয়েতে তখন আলিবাবার বুক কাঁপছে, ঠ্যাং কাঁপছে। তার যেন একটা ব্যাঙ হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

ঘোড়ায় চড়া লোকগুলো আলিবাবার সেই গাছের কাছে এসে পড়ল। আলিবাবার মনে হল—ওরা চোর, ডাকাত, দস্যু, বাটপাড়, হানাদার। ওরা ছিল মোট চল্লিশজন। তারা তখন ঘোড়ার ওপর থেকে নামল। ঐ চোরদের মধ্যে একজন হচ্ছে তাদের সর্দার। তার নাম জবরবাহাদুর। ইয়া বড় গোঁফ তার। ইয়া লম্বা দাড়ি তার। তার চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। তার মাথার লম্বা লম্বা চুল যেন একটা হুলস্থুল কাণ্ড করে ফেলতে পারে।

সেই জায়গায় সেই পাহাড়টার গায়ে ছিল খুব বড় একটা গুহা। সেই গুহাটার মুখে ছিল একটা কপাট। জবরবাহাদুর সেই কপাটের সামনে দাঁড়াল। দু-হাত দিয়ে শূন্যে কয়েকটা ঘুষি মারল। দু'পা দিয়ে কয়েকটা লাথি মারল। আকাশের গালে চড় মারার ভঙ্গী করল। তারপর বলে উঠল,—"খোল সিসেম! খোল!"

গুহাটার বন্ধ দরজাটা তখনই খুলে গেল। চোরগুলো সব এক এক করে তার ভেতরে ঢুকে গেল। সর্দার ঢুকল সবার শেষে। গুহার দরজা অমনি আপনা থেকে পট্ করে বন্ধ হয়ে গেল।

আলিবাবা ঐ দেখে ভাবল,—একি কাণ্ড! কয়েকটা পেঁচা অমনি ডেকে উঠল!—কয়েকটা বাঁদর নানা গাছের ডালে ডালে লাফ দিল। বনের ভেতরে বাঘ ডেকে উঠল,—হালুম-হালুম।

আলিবাবা আঁৎকে উঠে ভাবল,—এইবার বুঝি বাঘের পেটে গেলুম! অনেক সময় চলে যায়! আর কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। এইবার হঠাৎ গুহাটার বন্ধ দরজাটা আবার খুলে গেল।

চোরদের সর্দার জবরবাহাদুর প্রথমে গুহার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর এক এক করে সব কয়টা চোরই বেরিয়ে এল।

তারপর সর্দার জবরবাহাদুর বলে উঠল,—"সিসেম বন্ধ!—সিসেম বন্ধ।" গুহার দরজার কপাট তখনই বন্ধ হয়ে গেল। তাই দেখে আলিবাবার বুকের ভেতরে যেন একটা বিজলী খেলে গেল!

চোরেরা তখন সবাই ঘোড়ায় চড়ল। ঘোড়ার লাগাম ধরল। ঘোড়াকে চাবুক মারল। ঘোড়াগুলো চলল। তাই দেখে আলিবাবা মনে মনে ভগবানের নাম বলল। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার মনটা এইবার আনন্দে নাচল।

চোরেরা চলে গেল। আলিবাবা গাছ থেকে নেমে এল। সে ভাবল,—ঐ গুহাটার ভেতরে ঐ চোরদের

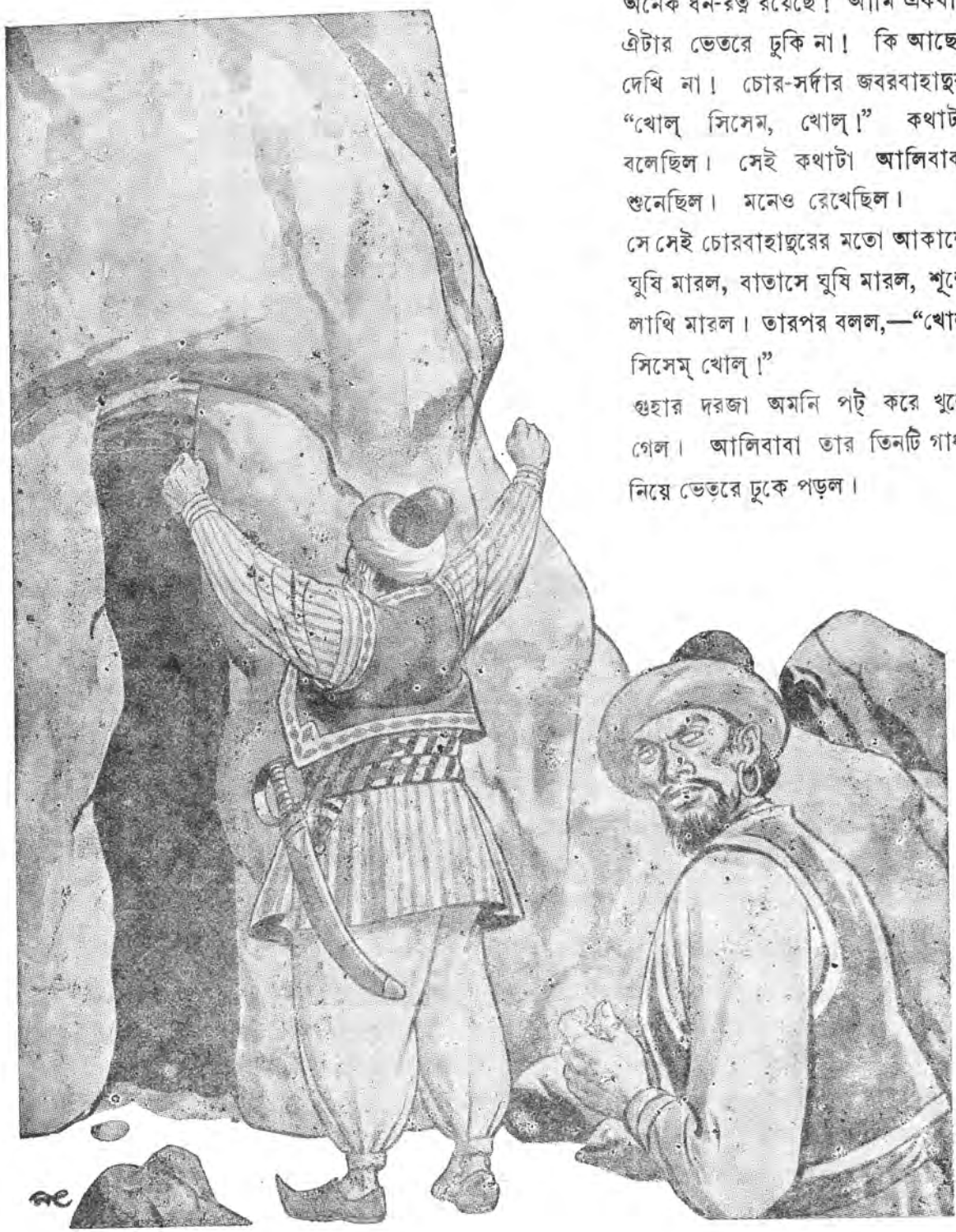

অনেক ধন-রত্ন রয়েছে! আমি একবার ঐটার ভেতরে ঢুকি না! কি আছে, দেখি না! চোর-সর্দার জবরবাহাদুর "খোল্ সিসেম, খোল্!" কথাটা বলেছিল। সেই কথাটা আলিবাবা শুনেছিল। মনেও রেখেছিল।

সে সেই চোরবাহাদুরের মতো আকাশে ঘুষি মারল, বাতাসে ঘুষি মারল, শূন্যে লাথি মারল। তারপর বলল,—"খোল্ সিসেম্ খোল্!"

গুহার দরজা অমনি পট্ করে খুলে গেল। আলিবাবা তার তিনটি গাধা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

গুহার দরজা অমনি পট্ করে বন্ধ হয়ে গেল। আলিবাবার তখন কত আনন্দ। গুহার ভেতরে ঢুকে আলিবাবার মনে হল, সে যেন মণি-মাণিক-রত্ন-হীরা-জহরতের মুলুকে এসে পড়েছে।

তার সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সে যে কত মণি-মাণিক! কত হীরা-জহরত! কত দামী দামী জামা কামিজ! তার যেন আর অন্ত নেই।

আলিবাবা তাড়াতাড়ি করে রাশি রাশি মণি-মাণিক, হীরা-জহরত তিনটা বস্তার পেটের ভেতর ভরল! সেই বস্তাগুলো গাধার পিঠে চড়াল। তারপর বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বলে উঠল,—"সিসেম বন্ধ! সিসেম বন্ধ!" তখনই গুহার দরজা হয়ে গেল বন্ধ। আলিবাবার মনে তখন খুব আনন্দ।

তখন আকাশে সূর্যের চেহারা আর নেই। রাত এসে তাকে মাত করেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। হাজার হাজার তারা তার চারধারে জুটেছে ও ফুটেছে।

আলিবাবা বস্তা-ভরা মণি-মাণিকের বস্তাগুলো গাধার পিঠ থেকে নামাল। ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। বস্তা দেখে আলিবাবার বউ বলে উঠল, "এ সব বস্তায় কি আছে? "যা আছে, তা দেখলে, তুমি হবে খুশী—খুশীর উপর খুশী।"—বলে উঠল আলিবাবা। সে বস্তার মুখ খুলে ফেলল। সব কিছু ঢেলে ফেলল। নানান রঙের মণি-মাণিক ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর। তাই দেখে আলিবাবার বউ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। তার মনে হল, এসব যেন ভূতের কাণ্ড। তাদের ভাঙা ঘরে এত মণি-মাণিক, তা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারল না।

সে বলে উঠল,—"ওগো আমার স্বামীমশাই, তুমি এ সব কোথায় পেলে? চুরি-ডাকাতি করে এনেছ, না, ভূতের কাছ থেকে এনেছ? না, পরীর কাছে পেয়েছ?"

আলিবাবা ব্যস্তভাবে বলল,—"এ সব পেয়েছি কপালের জোরে। সে সব কথা পরে হবে। এখন এই সব তাড়াতাড়ি গুনে ফেল। কতগুলো পেয়েছি, তা দেখা যাক্।"

"এ সব কি গুনে শেষ করা যাবে দু-চার দিনে?" বলে উঠল আলিবাবার বউ। "গুনে শেষ করা যাবে না। এসব ওজন করতে হবে গো।"

"কিন্তু ওজন কি দিয়ে করবে।—বলে উঠল আলিবাবা। "আমাদের ঘরে তো দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা নেই।"

"তোমার ভাই কাশিমের বাড়িতে তা আছে। আমি এখনই গিয়ে নিয়ে আসছি।"—বলতে বলতে আলিবাবার বউ এক দৌড়ে চলে গেল কাশিমের বাড়িতে।

কাশিমের বড় বাড়ি, বড় ঘর। তার অনেক টাকা-কড়ি।—আর এদিকে তার ভাই আলিবাবা একদম গরীব।

তাই কাশিমের বউ আলিবাবা এবং তার বউকে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। কাশিমের বউ আলিবাবার বউকে দেখে বলে উঠল,—"কি গো এত রাত্রে কেন এসেছ। ঘরে খাবার নেই বুঝি।"

আলিবাবার বউ একটু হাসল। মনে মনে বলল,—"আমাদের ঘরে যা আছে, তা দিয়ে তোদের একলাখ বার কিনতে পারি।"

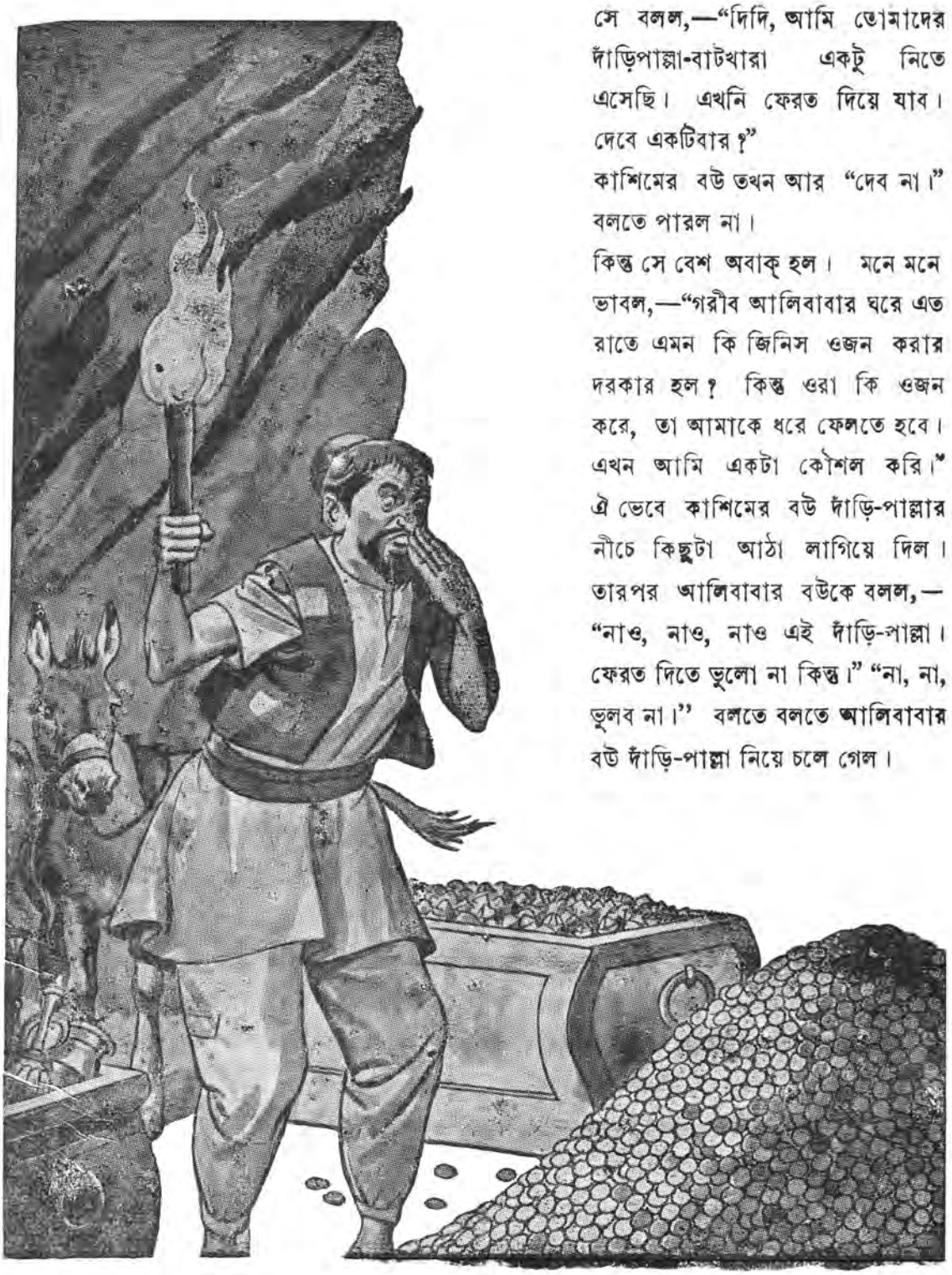

সে বলল,—"দিদি, আমি তোমাদের দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা একটু নিতে এসেছি। এখনি ফেরত দিয়ে যাব। দেবে একটিবার?"

কাশিমের বউ তখন আর "দেব না।" বলতে পারল না।

কিন্তু সে বেশ অবাক্ হল। মনে মনে ভাবল,—"গরীব আলিবাবার ঘরে এত রাতে এমন কি জিনিস ওজন করার দরকার হল? কিন্তু ওরা কি ওজন করে, তা আমাকে ধরে ফেলতে হবে। এখন আমি একটা কৌশল করি।" ঐ ভেবে কাশিমের বউ দাঁড়ি-পাল্লার নীচে কিছুটা আঠা লাগিয়ে দিল। তারপর আলিবাবার বউকে বলল,—"নাও, নাও, নাও এই দাঁড়ি-পাল্লা। ফেরত দিতে ভুলো না কিন্তু।" "না, না, ভুলব না।" বলতে বলতে আলিবাবার বউ দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে চলে গেল।

তারপর আলিবাবা আর তার বউ মণি-মাণিক ওজন করতে লেগে গেল। মণি-মাণিক ওজন করতে অনেক সময়ই লাগল। ওজন হতে হতে, একটা মাণিক দাঁড়িপাল্লার নীচের সেই আঠায় এঁটে গিয়ে লেগে রইল। আলিবাবা বা তার বউ তা মোটেই দেখতে পেল না।

আলিবাবার বউ তখন সেই দাঁড়ি-পাল্লা ও বাটখারা কাশিমের বউকে দিয়ে এল।

কাশিমের বউ তখনই দাঁড়ি-পাল্লার সেই আঠা লাগানো জায়গাটায় দৃষ্টি দিয়ে দেখল—একটা মাণিক আলিবাবার বাড়ি থেকে তাদের বাড়িতে চলে এসেছে। কাশিমের বউ তখন যে কতখানি অবাক হল, তা তো বোকারাও বুঝতে পারে। সে ভাবল,—গরীব আলিবাবা এত মণি-মাণিক কোথায় পেল? কি করে পেল! কেন পেল।—তার এত মণি-মাণিক হয়েছে যে, তা গুনে শেষ করা যায় না, তাই ওজন করতে হয়।—এ তো যেমন তেমন ব্যাপার নয়। কাশিমের হিংসুটে বউ যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কাশিম সেদিন বাড়িতে ছিল না। তাই তার বউ তখনই তাকে সে কথা জানাতে পারল না। "আলিবাবা হয়ে গেল বড় লোক। এখন তো আমরা তার কাছে ছোট লোক।" এই সব ভাবতে ভাবতে, সারারাত তার ঘুমই হল না। চোরের মতো রাত জেগেই তার রাত কাটাতে হলো। সে বারবারই বলতে লাগল, কাঠুরে আলিবাবার কপাল কত!

পরের দিন কাশিম বাড়িতে এল। তখনই তার বউ বললে, "আলিবাবা বড় লোক। আমরা ছোট লোক।" কাশিম ঐ কথার অর্থ মোটে বুঝতে পারল না। সে তার বউকে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছ। কি হয়েছে।"

"কি হয়েছে।" বলে উঠল কাশিমের বউ ঠিক একটা ভালুকী ভঙ্গী করে। "আলিবাবা বড় লোক হয়েছে। তার কত মণি-মাণিক হয়েছে। সে সব গুনে শেষ করতে পারে না। তাই সেগুলো দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে ওজন করে।

ঐ কথা শুনে কাশিম যেন হিমসিম খেয়ে গেল। কতক্ষণ সে ঝিম মেরে রইল।

তখন আলিবাবার সেই মণি-মাণিক ওজন করার কথা কাশিমের বউ তাকে বলল। কাশিম তখনই চলল আলিবাবার বাড়িতে।

আলিবাবার দেখা পাওয়া মাত্রই সে বলে উঠল,—"ওহে আলিবাবা, সবাই মনে করে তুমি একটি হাবা। কিন্তু তুমি নাকি আজকাল তোমার মণিটনি দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে ওজন কর? তাই বুঝি দাড়িও রেখেছ বেশ বড়। এখন আমার কাছে সব কথা খুলে বল। যদি তা না বল, তাহলে এখনই আমি সুলতানের কাছে খবর পাঠাব। তোমার রাশি রাশি মণি-মাণিকের কথা তাঁকে জানাব। তখন সুলতানের সিপাই এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর তোমাকে কি খাওয়াবে, তা জানো? খাওয়াবে কিল আর কিল। তাই দেখে সবাই হাসবে খিলখিল।"

আলিবাবা বুঝতে পারল যে, তার হিংসুটে ভাইটি সবই জেনে ফেলেছে। তবু সে বলে উঠল,—"তুমি এসব কি বলছ, ভাইজান?"

কাশিম যেন কেউটে সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। কড়া গলায় বলল,—"তুমি যে জায়গায় অত সব মণিটনি পেয়েছ, সেই জায়গার সন্ধান আমাকে দাও। তা না হলে তুমি যাতে নিপাত যাও, তা আমি আজই করব।"

আলিবাবা সোজা সরল মানুষ। তাই সে খুবই ভয় পেল। সেই চোরদের সেই ধন-রত্নের গুহার কথা সবই কাশিমকে বলে দিল। "খোল্ সিসেম। সিসেম বন্ধ।"—এ কথা বলে দিতেও ভুলল না।

কাশিম তখনই "খোল সিসেম। সিসেম বন্ধ।" এই কথা আওড়াতে আওড়াতে নিজের বাড়ি চলে গেল।

সে তার বউকে বলল সব কথা।

তাই শুনে কাশিমের বউ যেন তখনই কোটি কোটি মণি-মাণিক্য পেয়ে গেল। তার তখন সে কি ফুর্তি আর ফড়ফড়ি! সে একবার দেয় মেঝের উপর গড়াগড়ি, আবার নাচতে থাকে নেংটি ইঁদুরের মতো।

কাশিম তখনই তার কয়েকটা গাধা আর কয়েকটা বস্তা নিয়ে চলল সেই জঙ্গলের দিকে। তার দাড়িতেও কয়েকবার ঝাড়া দিল আর নাড়া দিল।

চলতে চলতে সে সেই গুহার দরজা খোলবার মন্তর আওড়াতে লাগল বারবার। তারপর কাশিম গিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। সেই গুহাটা সে পেল।

সে বলে উঠল—"খোল্ সিসেম।" তখনই গুহার দরজা খুলে গেল। কাশিম ফুর্তিতে প্রায় নাচতে নাচতে গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। তার গাধা-দাদাদেরও ঢোকাল। গুহার দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

কাশিম তখন সেই গুহার ভেতরে এত মণি-মাণিক, হীরা-জহরত দেখল যে, স্বপ্নেও হয়তো অতটা দেখা সম্ভব নয়! সে বেশ কিছু সময় ধরে হাঁ করে চেয়ে রইল সেই রাশি রাশি ধন-রত্নের দিকে। তারপর সে তার সব কয়টা বস্তায় মণি-মাণিক, হীরে-জহরত ভরল ঠেসে ঠেসে। তারপর বস্তার মুখ বেঁধে ফেলল। এইবার সে সেই গুহার দরজার কপাট খোলবার জন্য সেই জাদুমন্তরটা আওড়াতে চাইল। কিন্তু—হায় রে হায়!—জাদুমন্তর তখন তার মোটেই মনে নেই! সে রাশি রাশি ধন-রত্ন পাওয়ার চোটে জাদুমন্তর একদমই ভুলে গেছে। কাশিম তখন বারবার এক হাজারবার চেষ্টা করল সেই মন্তর মনে করার জন্য। কিন্তু মন্তর কি আর মনে আসে। মন্তর মনে আসে আসে, আসে না।—সেই গুহার দরজাও কিছুতেই খোলে না! ভয়েতে তখন কাশিমের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে! তার গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। সে শুধু 'হায় হায়' করছে! সে যত মণি-মাণিক তার বস্তার ভেতরে ভরেছে সে সবই যেন মনে হতে লাগল ছাই-পাঁশ!

সে শুধু বলতে লাগল—"সর্বনাশ! সর্বনাশ! আমার এবার আর রক্ষা নেই।" ঠিক সেই সময়ে চোরদের দল সেখানে এসে পড়ল। চোর-সর্দার জবরবাহাদুর আকাশে বাতাসে কিল-ঘুষি-চড়-লাথি মারল। তারপরই বলল,—"খোল সিসেম, খোল!"

কেটে গেল সব গোল। গুহার কপাট খুলে গেল। আর তখনই চোরেরা কাশিমকে দেখতে পেল। ভয়েতে কাশিমের প্রাণ তখন যেন উড়ে গেল। সে চোরের সর্দারকে ধাক্কা মেরে গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু সেই ধাক্কা মারবার ফলে তারই অক্কা পাওয়ার ব্যবস্থা হল। চোর-সর্দার জবরবাহাদুর তার তলোয়ার চালিয়ে দিল কাশিমের ওপর।

সেই সময়ে কাশিমের গাধাগুলো ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি করে বাইরে বেরিয়ে গেল। আর কাশিম একটা আর্তনাদ করে ধুলোর ওপর পড়ে গেল।

মরে গেল। মরে গেল। মণি-মাণিকের লোভে মরে গেল কাশিম।

চোরেরা তখন দেখল যে, গুহার ভেতরের সব মণি-মাণিক সেখানে নেই। তারা তখন ভাবল, অন্য যদি কেউ এই গুহার ভেতরে ঢুকতে চায়, তা হলে সে যাতে ভয় পায়, এখন আমাদের তাই করতে হবে। এই ভেবে তারা কাশিমের দেহটাকে কেটে চার ভাগ করে টাঙিয়ে রাখল।

কাশিম যখন অক্কা পেল, তখন তার বাড়িতে তার বউ কি করছে?—সে তখন পান চিবুচ্ছে। কিন্তু তার মনটা কেমন কেমন করছে। সে ভাবছে, এই ঘোর রাতে সে কি পড়ল কোন ভূতের হাতে? তাকে কি মেরে ফেলল ডাকাতে?

—ঐ রকম সব বিপদ হওয়ার কথা সে ভাবতে লাগল। সারারাত ঘুম তার চোখের কাছেও এল না! সে কিছুই খেল না। মাঝে মাঝে খেল শুধু পান। তবু ঠাণ্ডা হল না তার প্রাণ। তার মনের মধ্যে চলতে লাগল যেন দৈত্য-দানবের ধুমধাম।

রাত চলে গেল। কিন্তু কাশিম ফিরে এল না। কাশিমের বউ তখনই ছুটে গেল আলিবাবার কাছে। তাকে দেখা মাত্রই আলিবাবা বলে উঠল,—"কি গো বউঠাকরুন, আমার ভাই কাল রাশি রাশি মণি-মাণিক নিয়ে এসেছে তো?—তোমরা আগের চেয়েও বড়লোক হয়েছ তো?

কাশিমের বউ-বিবি কেঁদে ফেলল। সে হাউমাউ করে বলল,—"তোমার ভাই ফিরে আসে নি।"

ফিরে আসে নি? তা হলে নিশ্চয় কোন ফেরে পড়েছে।"—বলে উঠল আলিবাবা। "আমি এখনই যাই। দেখি ভাইয়ের খোঁজ পাই, কি, না পাই। বলতে বলতে আলিবাবা তার তিনটি গাধা নিয়ে চলে গেল সেই গুহার দিকে। পথে যেতে যেতে সে কয়েকবার বাঘের হালুম-হুলুম ডাক শুনল। বাঁদরের ভেংচিও দেখল। পোকার কামড়ও খেল। আলিবাবা সেই গুহার দরজায় পৌঁছে গেল। সে দেখল, সেখানে কিছুটা রক্ত পড়ে রয়েছে। সে আঁতকে উঠল। চমকে উঠল। সে আকাশে বাতাসে কিল-লাথি মারল। তার মুখ থেকে মন্তর বার করল। "খোল্ সিসেম খোল্।

গুহার দরজা পট করে খুলে গেল। তখন আলিবাবা যা দেখল, সে কী ভীষণ! সে কী ভয়ংকর। থরথর করে তার শরীর কাঁপতে লাগল! সে দেখল কাশিমের মাথাটা পড়ে রয়েছে। তার শরীরটা চার ভাগ করা হয়েছে। সেই চার ভাগ দরজার দু-ধারে ঝুলছে।

আলিবাবা তখন ভয়ের চোটে ভিরমি খায় খায়। সে তাড়াতাড়ি করে কাশিমের মৃতদেহের সব টুকরাগুলো একটা বস্তার ভেতরে ভরল। অন্য সব বস্তায় পুরে নিল রাশি রাশি মণি-মাণিক। সেই সব বস্তা গাধার পিঠে চাপালো, আর সে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

সে বলে উঠল—"সিসেম বন্ধ।" গুহার কপাট পট্ করে বন্ধ হয়ে গেল। আলিবাবা ভয়ে ও উত্তেজনায় গাধাগুলোকে জোরসে তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি মণি-মাণিক-ভরা বস্তাগুলো নিজের ঘরে নিয়ে গেল। তারপর কাশিমের মৃতদেহের টুকরো-ভরা বস্তাটা কাশিমের বাড়িতে নিয়ে গেল। কাশিমের বাড়িতে একটি চাকরানী ছিল। তার নাম মর্জিনা। সে ছিল খুবই সুন্দরী, চতুর আর বিশ্বাসী। মর্জিনাই

প্রথমে আলিবাবাকে দেখতে পেল। সে বলে উঠল,—"আমাদের কর্তা কাশিম সাহেব আসেন নি?"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছে সে। এখনই তাকে দেখতে পাবে।" বলতে বলতে আলিবাবা বস্তার মুখটা খুলে ফেলল। বলে উঠল, "এই তো কাশিম-সাহেব। দেখ তাকে!"
মর্জিনা কাশিমের কাটা মাথাটা দেখে আঁৎকে উঠল। তার গা দিয়ে ঘাম ছুটল।
আলিবাবা বলে উঠল,—"সাবধান! সাবধান! কাশিম যে এইভাবে মরেছে, তা কারুর কাছে বলবে না। তোমরা বলবে যে, সে রোগে ভুগে মরেছে।"
ঐ সময়ে কাশিমের বউও সেখানে এসে পড়ল। কাশিমকে ঐ অবস্থায় দেখে সে নিজের কপালে চড়-চাপড় মারতে লাগল।
আলিবাবা বলল,—"কয়েকটা ডাকাত কাশিমকে নিপাত করেছে। কিন্তু খবরদার! একথা যেন কেউ জানতে না পারে। লোককে জানাতে হবে যে, সে রোগে ভুগে যমের বাড়ি চলে গেছে। এইবার খুব গোপনে এই মৃতদেহ কবর দিতে হবে। তার জন্য এই মৃতদেহের চারটা অংশ বেশ করে জোড়া দিতে হবে। যারা সেই কাজ করে তাদের একজনকে খুব গোপনে ডেকে আনতে হবে। কে সেই লোককে খুঁজতে যাবে, ডাকতে যাবে?"
মর্জিনা বলে উঠল,—"আমি যাব। এই রাতটা চলে গেলেই আমি বেরিয়ে পড়ব সেই লোকের খোঁজ করতে।"
মৃতদেহ সাবধানে রাখ! সারা রাত জেগে থাক! ঘুমকে ঘরে ঢুকতে দিও নাকো।"—বলতে বলতে আলিবাবা নিজের বাড়ি চলে গেল। যেতে যেতে সে বারবার আঁৎকে উঠল, আর পেছন ফিরে চাইতে লাগল। তার যেন মনে হতে লাগল, কাশিম খুন হয়ে গিয়ে ভূত হয়েছে, আর তার পেছনে পেছনে আসছে, হাসছে, নাচছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তাকে যেন ভয় দেখাচ্ছে, আর তাড়া করছে।
পরের দিন ভোর হতেই আলিবাবা এবং তার বউ বারবার কাশিমের বাড়িতে যেতে লাগল। আবার সেখান থেকে নিজেদের বাড়ি আসতে লাগল। তাদের মুখ খুব ভার। যেন তাদের খুবই চিন্তা, ভাবনা, অশান্তি। আলিবাবা পাড়া-পড়শি সকলকে জানিয়ে ছুটল হাকিমের বাড়ি! হাকিমটা ছিল পাগলা। কোন কথা না শুনেই তখনই একটা ওষুধ বার করে আলিবাবার হাতে দিয়ে দিল। কি রোগ যে হয়েছে, কি রোগ সারাবার জন্য ওষুধ দরকার, তা একবার জিজ্ঞাসাও করল না।
আলিবাবা বলল,—"কি রোগ সারাবার জন্য ওষুধ দিলেন, হাকিম সাহেব?"
হাকিম বলে উঠল,—"সব রোগ সারাবার জন্য এই ওষুধ দিলাম। এই ওষুধে জ্বর, পেটব্যথা, কান কামড়ানি, আমাশায়, পেটকাঁপা, চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা এবং আরও দশ-বারো-পনরটা রোগ ঘুচে যাবে, মুছে যাবে, দূরে যাবে, সেরে যাবে, বেড়ে যাবে!"
"বেড়ে যাবে? রোগ বেড়ে যাবে?"—আঁৎকে উঠে বলে উঠল আলিবাবা।

"না, না, বেড়ে যাবে না। সেরে যাবে, সেরে যাবে।—সব রোগ সেরে যাবে।"—জোর গলায় বলল সেই হাকিম।

আলিবাবা বলল,—এই ওষুধের দাম কত?"

পাগলা হাকিম বলে উঠল,—"এই ওষুধের দাম—পিঠের ওপর দুমদাম।"—বলতে বলতেই সেই হাকিম সাহেব আলিবাবার পিঠের ওপর ওষুধের দাম দুম্‌দাম্‌ লাগিয়ে দিল কয়েকবার।

আলিবাবা সেখান থেকে ছুটল বাইরে। সে নিজের বাড়িতে ফিরে এল। কাশিমের খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। এই ভাবটা লোককে দেখাতে লাগল আলিবাবা, তার বউ আর মর্জিনা।

সেই রাতটা যখন চলে যায় যায়, তখন মর্জিনা কাশিমের বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিছু পথ চলবার পর সে দেখল, এক বুড়ো মুচি তার দোকানের দরজা খুলছে। মর্জিনা সেই বুড়োর সামনে গিয়ে বলল,—সেলাম চাচা, সেলাম! আজ এই ভোরে তোমার মুখ দেখতে এলাম!" ঐ কথা বলেই সে একটা সোনার মোহর সেই বুড়োর হাতে দিয়ে দিল। বুড়ো সেটা নিয়ে নিল। সেই বুড়োর নাম বাবা মুস্তাফা। সে বলে উঠল,—"ওগো মেয়ে, আমাকে তুমি কি কাজ করতে বলছ? আমাকে দিয়ে কি কাজ করাতে চাও?"

মর্জিনা একটুকাল কি একটু ভাবল। তারপর তার মনের কথাটা বার করল, "চাচা সাহেব, তুমি সেলাই করার সুতো আর সুঁচ তোমার সাথে নাও। তারপর আমার সাথে চল।"

বাবা মুস্তাফা বলে উঠল,—"কোথায় যাব? সেখানে গিয়ে কি কাজ করতে হবে?"

মর্জিনা তখন আর একটি মোহর সেই বুড়োর হাতে দিয়ে দিল। বলল,—"কোথায় যাবে, কেন যাবে—সে সব কথা পরে হবে। এখন একটা রুমাল দিয়ে আমি তোমার চোখ বেঁধে দেব। তোমার হাত ধরে তোমাকে নিয়ে যাব। কাজ শেষ হওয়ার পর আরও মোহর দেব। তখন তুমি কতই আনন্দ পাবে। দু-চার মণ রসগোল্লা কিনে খাবে।"

কিন্তু বাবা মুস্তাফা মর্জিনার কথায় রাজী হতে চায় না।

মর্জিনা তখন আর একটা মোহর বার করল। সেটা মুস্তাফা বুড়োর হাতে দিয়ে দিল। মুস্তাফা ভাবল,—"ব্যাপারটা তো বেশ তোফা! যাই এই মেয়ের সাথে। দেখি এ কোথায় আমাকে নিয়ে যায়।" বুড়ো তখন বলল, "তুমি একান্তই আমাকে না নিয়ে আর ছাড়বে না?—বলতে বলতে সে তার সুঁচ আর সুতো নিয়ে নিল।

মর্জিনা তখন একটা রুমাল দিয়ে বাবা মুস্তাফার চোখ বাঁধল। তার হাত ধরে নিয়ে চলল কাশিমের বাড়ির দিকে। বাবা মুস্তাফা অন্ধ নয়। তবু সে অন্ধের মত চলল। মর্জিনা মুস্তাফা বুড়োর হাত ধরে নিয়ে চলেছে। বুড়ো চলে আর মাঝে মাঝে হোঁচট খায়। চালাক মেয়ে মর্জিনা বুড়ো বাবা মুস্তাফাকে কাশিমের বাড়িতে নিয়ে এল। বাবা মুস্তাফা কোন্ পথ দিয়ে, কত দূরে, কোথায় এল, তা সে মোটেই জানতে পারল না। কারণ তার চোখ রয়েছে রুমাল চাপা।

কাশিমের মৃতদেহ যে ঘরে ছিল, মর্জিনা বাবা মুস্তাফাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল। এইবার বাবা মুস্তাফার চোখের উপর থেকে রুমাল খুলে নেওয়া হল। মুস্তাফা দেখল, একটা মানুষের শরীর চার খণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে।

মর্জিনা বলল,—"মুস্তাফা চাচা, তাড়াতাড়ি করে এই মৃতদেহটা সেলাই করে দাও। আরও অনেক মোহর পাবে—রসগোল্লা খাবে।"

বুড়ো বাবা মুস্তাফা তাড়াতাড়ি করে কাশিমের মৃতদেহটায় জোড়া লাগল। তারপরেই মোহর পাওয়ার জন্য হাত পাতল।

"এই নাও মোহর।" বলতে বলতেই মর্জিনা সেই বুড়োর হাতে লাগিয়ে দিল একটা চিমটি। বুড়ো তেড়ে উঠল,—"আমি তোমাদের সব ফাঁকিজুকি ফাঁস করে দেব। তখন তোমরা ফেঁসে যাবে!—তোমরা এই লোককে খুন করেছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি!"—বলতে বলতে বুড়ো বাবা মুস্তাফা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় একটা দৌড় দিল।

মর্জিনা বুড়োর হাতটা ধরে ফেলল আর একটা মোহরও তার হাতে দিল। সেই মোহর বুড়ো মুস্তাফাকে বশ করে ফেলল।

মর্জিনা তখন বাবা মুস্তাফার চোখে আবার রুমাল বাঁধল। তার হাত ধরে নিয়ে চলল তার আস্তানায়। পথ চলতে চলতে মর্জিনা বার বার বলতে লাগল, "চাচা সাহেব, চাচাজী! তোমার চোখ যা দেখছে, তোমার মুখ যেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলে!"

"না, না, না! বলব না, বলব না!—বারবার বলতে লাগল সেই বুড়ো বাবা মুস্তাফা।

তারপর কাশিমের মৃতদেহ চলে গেল কবরখানায়। তার বউ কাঁদল, মর্জিনা কাঁদল। আলিবাবা আর তার বউও না কেঁদে ছাড়ল না।

ঘোড়া ছুটছে! ধূলো উড়ছে। ঐ কারা আসছে? কারা হিহি-হোহো করে হাসছে? তাদের হাতের তলোয়ার যেন নাচছে।

ঐ ওরাই সেই কুড়ি জোড়া চোর—দশগুণ্ডা গুণ্ডা! চোরেরা তাদের সেই মণি-মাণিকের গুহার দরজায় এসে পড়ল। সবাই ঘোড়া থেকে নামল। তারপর সবাই মিলে সেখানটায় কয়েকবার ঘুরপাক খেল। চোরদের সর্দার জবরবাহাদুর তখন আকাশে-বাতাসে কিল-ঘুষি-লাথি-চড় মারল। তারপর বলে উঠল, —"খোল্ সিসেম্! খোল্।" গুহার দরজা তখনই খুলে গেল।

তখন সেখানে তারা যা দেখল, তাতে তাদের পিলে চম্‌কে গেল। একটা মানুষকে তারা খুন করে তার মৃতদেহ চার ভাগ করে টাঙিয়ে রেখেছিল, সেই চার ভাগ সেখান থেকে ভেগেছে—সেখানে নেই।

অনেক গুণ্ডাই তখন বুঝল,—তাদের চেয়েও কোন পাকা লোক তাদের সবকিছু জেনে ফেলেছে। আর সেই লোকই সেই চারটা টুকরো নিয়ে গিয়েছে। সেই লোক কয়েক বস্তা মণি-মাণিক্যও নিয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকটা চোর বলল, "এসব ভূতের কাণ্ড। ভূতেই মানুষের মৃতদেহের টুক্‌রো নিয়েছে এবং খেয়ে ফেলেছে। সেই ভূতকে ভেড়া বানিয়ে ফেলতে হবে। সেই ভূতের কান মলতে হবে, নাক মলতে হবে।" চোর-সর্দার জবরবাহাদুর এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি। সে গম্ভীর হয়েছিল। কি কাণ্ড যে হয়েছে, তাই ভাবছিল। এইবার সে কথা বলে উঠল। তার মুখ থেকে যেন বজ্রের শব্দ ছুটল :

আমাদের এই গুহার মণি-মণিক চুরি করতে চেয়েছিল একটা লোক। তাকে আমরা ধরেছি, খুন করেছি। কিন্তু আরও একটা লোক নিশ্চয়ই আছে। সে আমাদের সবকিছুই জেনেছে। এখন সেই লোকটাকে যদি আমরা ধরতে না পারি, তাহলে আমাদেরই ধরা পড়তে হবে, মরতে হবে।—তাই আমরা যদি মরণ এড়াতে চাই, তা হলে সেই শয়তান লোককে ধরা চাই, শেষ করা চাই।

অন্য চোরেরা গর্জে উঠল : চাই, চাই, চাই। ধরা চাই, মারা চাই, নিপাত করা চাই।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর আবার শব্দ করে উঠল : "আমাদের এই দলের মধ্যে যে লোক খুব সাহসী, খুব চতুর, খুব চালাক, সে এখন এক ভ্রমণকারীর বেশে সাজো। তারপর শহরে যাও। যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখ, এই কয়েকদিনের মধ্যে অদ্ভুতভাবে কেউ মারা গিয়েছে কিনা।" বলতে বলতে, সে থেমে গেল। আবার বলে উঠল,—"কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, যে ঐ ভাবে খোঁজ করতে যাবে, সে যদি ভুল খবর নিয়ে আসে, তাহলে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে।"

চোরগুলো বলে উঠল,—"তাই হবে! তাই হবে!" দেয়া হবে জ্যান্ত কবর, সে তো হবে জবর খবর!

সেই চোরগুলোর মধ্যে একটা চোর ছিল খুবই পাকা। অন্য চোরেরা তাকে ডাকত আজম বলে। সে তাদের সর্দারের চারধারে কয়েকবার ঘুরপাক খেল। দৈত্য-দানবের মতো চোখ করে কয়েকবার এদিক ওদিক চাইল। তারপর বিকট শব্দে বলে উঠল,—"আমাদের সর্দার যা বলল, আমি সেই সর্ত মেনে নিচ্ছি। আমি যদি মিথ্যা খবর নিয়ে আসি, তা হলে তোমরা আমায় ফাঁসি দেবে। আর যদি সত্যি সত্যি খবর নিয়ে আসি, তা হলে তোমরা আমায় আস্ত একটা খাসি খেতে দেবে। আমি সেইটা একাই খেয়ে ফেলব।"

আজম তখন এমন সব পোশাক পরে এমন একটা বেশ ধারণ করল যে, তার বাবাও হয়তো তখন তাকে চিনতে পারত না। সে আবার তখন তাদের সর্দারের চারধারে ঘুরপাক খেল। কয়েকবার ডিগবাজিও খেল। তারপর এক দৌড়ে চলে গেল।

রাত তখন ঘোর অন্ধকার। ভূত-দৈত্য-দানবের হল্লা ও এস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শিয়ালের হাঁক। আজম যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় শেষ হয় হয়। পূবদিক হাসতে চায় খিলখিল করে। শহর রাস্তায় আজম ঘুরতে লাগল। হঠাৎ সে দেখল, একটি লোক তার দোকানের দরজা খুলে ফেলল। সেই হচ্ছে বাবা মুস্তাফা।

ছদ্মবেশ-পরা সেই আজম চোর তখনই বাবা মুস্তাফার সামনে গিয়ে হাজির হল। বলে উঠল, "সেলাম, সেলাম। এই এত ভোরেও একটি ভাল মানুষের দেখা পেলাম।

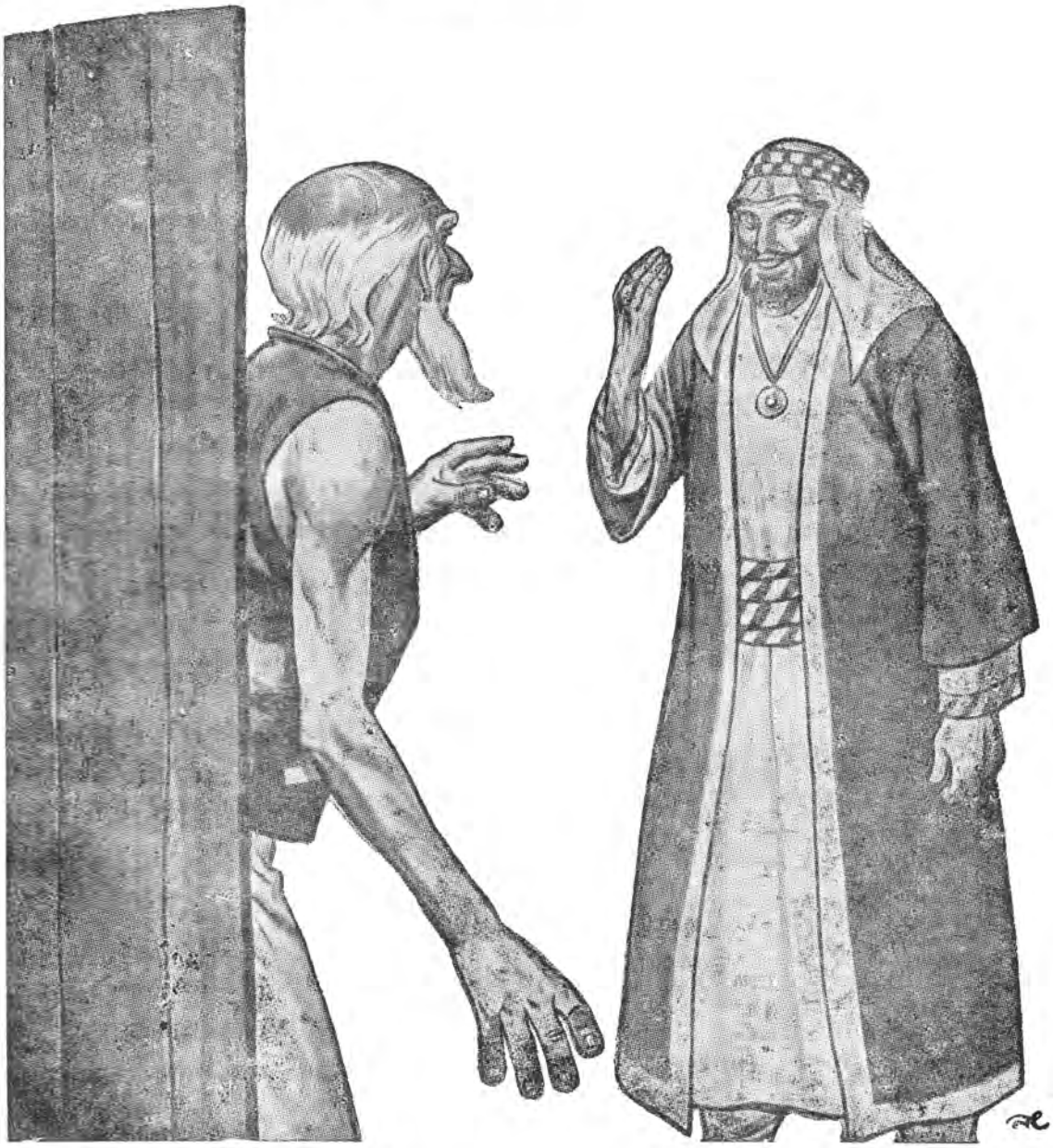

বুড়ো বাবা মুস্তাফা ঐ কথা শুনে বেশ একটু খুশীই হল। সেও সেলাম জানাল। ছদ্মবেশধারী চোরটা

তখন বলল,—"বুড়ো চাচা, তুমি এত ভোরে উঠে তোমার কাজ করতে শুরু কর? দিন হওয়ার আগেও তুমি বেশ দেখতে পাও?"

"নিশ্চয়ই পাই।" বলে ফেলল বাবা মুস্তাফা।—"এখন তো আঁধার প্রায় নেই। এর চেয়ে বেশি আঁধারের মধ্যেও এই ক'দিন আগে আমি এক জায়গায় একটা কাজ করেছি।"

"কি কাজ করেছ চাচা, কি কাজ করেছ?" খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল সেই চোরটা।

কিন্তু বাবা মুস্তাফা আর কিছু বলতে চাইল না।

ছদ্মবেশধারী চোরটা তখনই একটা মোহর দিয়ে দিল চাচা মুস্তাফার হাতে।

মুস্তাফার হাত যখন ঐ মোহর পেল, তখন হাতের কুটুম্ব মুখ আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলে ফলল, "একটা মৃতদেহের কয়েকটা খণ্ড একসঙ্গে সেলাই করেছি।"

ঐ কথা শুনে, চোরটা মনে মনে বলে উঠল,—"আমি যা খুঁজছি, তার কিছুটা এইবার পেয়ে গেছি।"

সে বলে উঠল, "এই শহরের কোন্ জায়গায়, কোন্ বাড়িতে সেই সেলাই কাজটা করেছ চাচা?"

কিন্তু চাচা কি আর সেই কথা বলতে চায়। তখন ছদ্মবেশধারী চোরটাও তাকে ছাড়ে না।

চাচা মুস্তাফা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—"ওরে বাছা, তুমি তো আমাকে ডাকছ চাচা। কিন্তু সেই কথা আমি বলতে পারি না।—কোথায় যে সেই সেলাই করার কাজটা করেছি, তা আমি সত্যিই জানি না। কারণ একজনে আমার চোখে রুমাল চাপা দিয়ে আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছে। কাজ শেষ হবার পর আবার চোখে রুমাল বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছে।"

চোরটা ঐ সব শুনে মনে মনে বলল,—"সেই জায়গাটার খোঁজটা তো কিছুটা পেয়ে গেলুম।"

সে তখন বাবা মুস্তাফার হাতে আর একটা মোহর দিয়ে দিল।

বাবা মুস্তাফা সেটা নিয়ে নিল।

চোরটা বলল,—"আচ্ছা চাচা, চোখ-বাঁধা অবস্থায় তুমি সেই জায়গায় গিয়েছ। তাই কোন্ পথ দিয়ে কোথায় গিয়েছ, তা তুমি জানতে পার নি। কিন্তু তবু তুমি বুড়ো মানুষ পাকা লোক। তাই সেই জায়গার একটা আন্দাজ তো তোমার আছে নিশ্চয়ই।"

বাবা মুস্তাফা সে কথা অস্বীকার করতে পারল না।

চোরটা তখন বলল,—"চাচা, আমিও এখন তোমার চোখে একটা রুমাল বাঁধব। তারপর তোমার হাত ধরে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাব। নিশ্চয় তুমি আন্দাজ করে সেই গোপন জায়গাটায় পৌঁছতে পারবে। চল, এখন চল।" বলতে বলতে সেই চোর, বাবা মুস্তাফার চোখ দুটো একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলল। বুড়োকে নিয়ে চলল তার হাত ধরে।

বুড়ো বাবা মুস্তাফা চোখে দেখতে পায়। তবু সে এখন অন্ধের মতো একজনের হাত ধরে যায়।—টাকার লোভে যে পড়ে সে ঐ রকমই করে।

বাবা মুস্তাফা চোখ-বাঁধা অবস্থায় চোরের সাথে চলছে। তার পা মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে। আর তার জামার জেবের মধ্যে চোরের দেওয়া মোহর কয়টা নাচছে।

অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা বাড়ির সামনে এল। তখন হঠাৎ বাবা মুস্তাফা বলে উঠল, "ওরে ভাই-পো আমার মনে হচ্ছে, এই জায়গা পর্যন্ত সেদিন এসেছিলুম। তারপর একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলুম।"

চোরটা বলে উঠল,—বুঝলুম, বুঝলুম! এই বাড়িই সেই বাড়ি।"

আসল ব্যাপারটাও হল ঠিক তাই। চোর আর তার চাচা মুস্তাফা তখন কাশিমের বাড়ির সামনেই পৌঁছে গেছে।

চোরটা তখন চাচা মুস্তাফার চোখের বাঁধন খুলে দিল। বাবা মুস্তাফা তখন আবার ভাল করে সেই বাড়িটার দিকে চাইল। বলে উঠল,—"বোধহয়, এই বাড়িটাই সেই বাড়ি!"

তখন চোরটা তাড়াতাড়ি সেই বাড়িটার প্রথম দরজার কপাটের উপর লাল খড়ি দিয়ে একটা দাগ কাটল।

ঐ বাড়িটা আবার দেখলে সে যাতে চিনতে পারে, সেইজন্যেই সে ঐ দাগ কাটল।

তারপর সে বাবা মুস্তাফাকে পৌঁছিয়ে দিল তার দোকানে

বুড়ো বাবা মুস্তাফা আবার চোরের হাত থেকে একটা মোহর পেল। খুশির চোটে তার মনটা কয়েকবার ডিগবাজি খেল।

চোরটা তখন চলে গেল তাদের দলবলের আড্ডায়।

কাশিমের বাড়ির দরজার কপাটের উপর তখন লাল খড়ির দাগটা জ্বলজ্বল করছে।

ঐ সময়ে ঐ বাড়ির সেই মেয়ে সেই মর্জিনা বাজারে যাওয়ার জন্য বাইরে এল। তখনই সেই লাল দাগটা তার চোখে পড়ল।

সে তখনই বুঝতে পারল, তাদের ঐ বাড়ির কর্তার বিরুদ্ধে খুব ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র কেউ না কেউ চালাচ্ছে। মর্জিনা ভাবল, আমাদের এই বাড়ির কর্তা তো এখন কাশিম-কর্তার ভাই আলিবাবা। আলিবাবাকে বাঁচানো দরকার। দুষ্ট লোকদের ষড়যন্ত্র পণ্ড করে দণ্ড দেওয়া দরকার।

মর্জিনা তখনই বাড়ির ভেতরে চলে গেল, লাল খড়ি নিয়ে এল, তারপর সেইখানকার সব কটা বাড়ির কপাটের ওপর ঠিক ঐ একই রকম লাল দাগ বসিয়ে দিল। সেই চোর যে সেখানে এসে ঐ কাশিমের বাড়িটা চিনে ফেলবে, তার আর কোন উপায় রইল না।

ওদিকে আজম চোরটা তখন তাদের আড্ডায় পৌঁছে গিয়েছে।

তাকে দেখা মাত্রই, চোরদের সর্দার জবরবাহাদুর এবং অন্য চোরগুলো একেবারে হইচই করে উঠল। তাদের ফুর্তি যেন ফড়ফড় করে ছুটল।

আজম চোর বলে উঠল,—সেই বাড়িটার সন্ধান পেয়েছি। সেই বাড়িটার গায় একটা লাল চিহ্ন দিয়ে এসেছি।"

"তা হলে চল এখন সেই বাড়িটা দেখতে" বলে উঠল চোর-সর্দার জবরবাহাদুর।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর তখন সেই আজম এবং আরও গোটা দুই চোরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল কাশিমের বাড়ির সামনে। তারা তখন দেখল, পাশাপাশি সব বাড়ির গায়েই ঠিক একই রকম খড়ির লাল দাগ জ্বলজ্বল করছে।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর তখন আজম চোরকে বলে উঠল,—"এ তো দেখছি অনেক বাড়ির গায়েই লাল দাগ বসানো রয়েছে। আমরা যাকে খুঁজছি, তার বাড়ি কোন্‌টা?"

আজম চোর তখন একেবারে বোকা বনে গেল। কোন্ বাড়িটার কপাটের ওপর সে লাল খড়ির দাগ দিয়েছিল তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর তখন তার চোরদের সাথে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল তাদের আড্ডায় সেই জঙ্গলের মধ্যে।

আড্ডায় পৌঁছে গিয়ে সে সব চোরকে জানিয়ে দিল,—আজম সেই বাড়িটা খুঁজে বার করতে পারে নি।

সব চোর তখন চটে গেল। রাগের চোটে যেন আগুন হয়ে উঠল।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর বলে উঠল,—"এই আজম এখন কি শাস্তি পাবে?"

আজমের মাথা কাটা যাবে ?"—ঘোর শব্দ করে একসঙ্গে বলে উঠল সব চোরেরা।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর তখনই তার তলোয়ার তুলল। এককোপে আজমের মাথাটা কেটে ফেলল। একটা আর্তনাদ উঠল। রক্ত ছুটল।

তারপর অনেকগুলো চোর মিলে অনেকক্ষণ ধরে আজমের সেই কাটা মাথাটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

তারা কাটা মাথাটায় একটা লাথি মারে। মাথাটা তখন ওপরে ওঠে। আবার দুম্ করে মাটির ওপর পড়ে। তখনই আবার তার ওপর লাথি পড়ে।

তাদের সেই খেলাটার নাম হচ্ছে মুণ্ড নিয়ে মজার খেলা। মুণ্ড নিয়ে মজার খেলা শেষ হওয়ার পর চোর-সর্দার জবরবাহাদুর ঠিক করল, সে নিজেই তাদের শত্রুর বাড়ি খুঁজে বার করবার জন্য চেষ্টা করবে।

সেই সর্দারটা তখন বিড়বিড় করে কি সব মন্তর পড়ল। তারপর খুব বড় একটা দানবের ছবির সামনে কয়েকবার সেলাম করল। তারপর চলে গেল তাদের শত্রুরের বাড়ি ঠিকভাবে চিনে ফেলবার জন্য।

কাশিমের বাড়ির সামনে চোর-সর্দার হাজির হল। তারপর সে ভাল করে চেয়ে দেখতে লাগল সেই বাড়িটা। বাড়িটার সামনের অংশটা ঠিক কি রকম, তা সে মনে মনে ভাল করে ঠিক করে রাখল। সে সেই বাড়িটার দেয়ালে কিন্তু কোনই খড়ির দাগ কাটল না। জবরবাহাদুর তখন সেখান থেকে চলে গেল তাদের আড্ডায় সেই জঙ্গলে।

তাকে দেখে চোরেরা চট্‌পট্ তাকে ঘিরে ফেলল। বলে উঠল,—"কি খবর সর্দার, কি খবর ?—সেই বাড়িটা ঠিকভাবে চিনে এসেছ ?"

"এসেছি, এসেছি।—চিনেছি, চিনেছি।" জোর গলায় বলে উঠল সেই পাকা চোরটি। তারপর সে একটা বিকট শব্দ করল। কয়েকটা ডিগবাজি খেল। আর একটা মুরগীকে আস্ত চিবিয়ে খেল। তাতে তার পেট ভরে গেল। বেশ উঁচু হয়ে উঠল। তখন তার মুখ থেকে কথার ফুলঝুরি ছুটল।

"ওরে আমার চতুর চতুর চোর-চেলার দল। আমি এখন তোদের হুকুম করছি, তোরা কয়েকজন করে একত্র হ'। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পড়। তারপর আশে-পাশের গাঁয়ের হাটে-বাজারে চলে যা। সেখানে কয়েকটা খচ্চর কিনে নে, আর বড় বড় জালাও কিনে নে। সেই সব জালা রাখতে হবে খালি। শুধু একটা মাত্র জালা থাকবে তেলে ভর্তি।" "ওঃ, কি ফুর্তি। কি ফুর্তি।" বলতে বলতে হইচই করে উঠল সেই জবরবাহাদুরের চোর-চেলারা।

তারা তখনই চলে গেল আশেপাশের হাটে-বাজারে। তিন-চারদিন ঘোরাঘুরি করে খচ্চর কিনল, জালা কিনল। সবগুলো নিয়ে এল সেই জঙ্গলে।

চোর-সর্দার তখন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল,—"আমাদের শত্রুকে শেষ করব।" চোরেরা চেঁচিয়ে উঠল,—শেষ!—শেষ!—শেষ।"

এইবার চোর, খচ্চর, জালা আর চোর-সর্দার।

ব্যাপারটা বেশ চমৎকার।

আটত্রিশটা চোর মোট আটত্রিশটা জালার ভেতরে ঢুকল। সকলের হাতেই রইল একটা করে ছোরা। সব ক'টা জালার গায়েই বেশ করে তেল মাখিয়ে দেওয়া হল। আর একটা জালার পুরোপুরিই তেল দিয়ে ভরা হল।

তখন সেই সব ক'টা জালা চাপল উনিশটা খচ্চরের পিঠের ওপর।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর সাজল এক সদাগর। তারা জঙ্গল থেকে বেরুল।

খচ্চর চলে। চোর চলে। আকাশে সূর্য চলে। বাতাস চলে।

কিছুকাল পরেই রাতের অন্ধকার এসে পড়ল। তাই দেখে, দিনের আলো ভেগে গেল।

চোরেরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় চলতে চলতে, কাশিমের সেই বাড়ির সামনে এসে পড়ল। তখনই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বেড়াল ম্যাঁও-ম্যাঁও করে ছুটল।

আলিবাবা তখন তামাক আর হাওয়া খাচ্ছিল সেইখানে বসে।

সে সেই খচ্চর, জালা আর চোর-সর্দারটাকে দেখে বলে উঠল,—"কে! কে!"

চোর-সর্দার জবরবাহাদুর তখন আলিবাবাকে লম্বা একটা সেলাম করল।

সেই সেলামের পরে সে তার শয়তানি বুদ্ধি চালাল।

বলল সে,—"আমি একজন সদাগর, খুব দূর থেকে এসেছি। এই তেলভরা জালাগুলো কাল এই শহরের বাজারে বেচে দিতে চাই। এখন এই রাতে কোথায় যাই? কোথায় একটু থাকবার জায়গা পাই?"

আলিবাবা ছিল খুবই ভাল লোক। সে বলে উঠল, "আপনি এই রাত্রে আমার এখানেই থাকতে পারেন।"

"বহুত খুশী। বহুত খুশী।"—বলে উঠল ছদ্মবেশী চোর-সর্দার জবরবাহাদুর।

আলিবাবা তখন তাদের বাড়ির ফটকের দরজা খুলে দিল। চোর-সর্দার তার সব খচ্চর আর চোরভর্তি জালাগুলো নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল একটা খোলা জায়গায়।

চোর-সর্দারটা তখন মনে মনে বলল—"এইবার এতদিনে আমার শত্রুকে শেষ করবার সুযোগ এসে গেল।"

আলিবাবা একজন চাকরকে বলল,—"এই সদাগরের খচ্চরগুলোকে ভুষি দে, ঘাস দে, জল দে।" তারপর

সে চলে গেল বাড়ির ভেতরে। মর্জিনাকে বলল—"এক সদাগর আমাদের এখানে থাকবে আজ রাত্রে। তার জন্য খাবার তৈরী কর। খাবারগুলো যেন বেশ ভাল হয়!"

মর্জিনা বলে উঠল,—"অতিথিকে এমন খাবার খাওয়াব যে, সারা জীবন তার তা মনে থাকবে। সেই খাবার একবার পেটের ভেতরে চলে গেলে, সেটা সেখানে পাকা বাড়ি তৈরী করে বাস করতে চাইবে!"

খচ্চরেরা আর চোরেরা যেখানটায় জায়গা পেল তার পাশেই একটা ঘরে থাকার জায়গা পেল সেই চোর-সর্দার।

আলিবাবা আর ছদ্মবেশী চোর-সর্দারটা তখন নানা রকম কথাবার্তা বলতে লাগল।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল
ইহকাল-পরকাল,
তেল-তাল-চাল-ডাল,
মানুষ-গরু-শকুন-বেড়াল,—

ইত্যাদি কত বিষয় সম্বন্ধেই তাদের দু'জনে কত কথাই বলল! তার মধ্যে মধ্যে তামাক-পান খুব করে চলল!

তারপর হল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। থালায় থালায়, বাটিতে বাটিতে নানারকম খাবার। তারা পর পর মুখের ভেতর ঢুকতে লাগল। মাঝে মাঝে ঢেঁকুর উঠতে লাগল। ফুর্তিতে পেট উঁচু হয়ে উঠতে লাগল।

মর্জিনা যোগাতে লাগল সেইসব খানা-পিনা।

আলিবাবা সেই সদাগরের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে বলতে লাগল,—"এসব খাবার কেমন লাগছে?

সদাগরের বেশধারী সেই চোর-সর্দার নানারকম খাবার তার পেটের মধ্যে পাচার করতে লাগল।

সে বলল,—"এমন খাওয়া কখনও খাই নি! এসব রান্না করেছে কি কোন ডাইনী?"

চোর-সর্দার তখন খায় আর বরাবরই এদিক ওদিক চায়।

তার মনের মধ্যে তখন শুধু শয়তানি।

খাওয়া যখন হয়ে গেল, তখন আলিবাবা আর চোর-সর্দার জবরবাহাদুর গোলাপ জল দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। তারপর রেশমী রুমাল দিয়ে হাত-মুখ মুছল। চোর-সর্দারটার পেটটা তখন নানারকম খাদ্য দিয়ে ঠাসা। সে বারবার বলতে লাগল,—"খাসা খানা খেলুম!—খাসা!—খাসা। আজ রাত্রে যে পাব এমন খানা, তা তো কখনো করি নি আশা!"

আলিবাবা খুব বিনয় করে হেসে হেসে বলল,—"আমি সামান্য লোক। যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, সেটা আপনি নিজগুণে ক্ষমা করবেন।"

চোর-সর্দারটা বলে উঠল,—না, না, কোনই ত্রুটি হয় নি। বেশ খেয়েছি, খুব খেয়েছি!"

আলিবাবা বলল,— এখন তো অনেক রাত হল। এখন ঘুম দরকার। আপনি শুয়ে পড়ুন। রাতটা আপনার ভালোয় ভালোয় কাটুক।"

"আপনারও কাটুক।" বলে উঠল পাক্কা শয়তান সেই চোর-সর্দারটা। আর সে তখন মনে মনে বলল,—"আজ তোমার গলা কাটব।"

আলিবাবা ঘুমোতে চলে গেল।

"আমার শত্রুকে শেষ করব। শেষ করব।"—এই কথাটা বারবার মনে মনে বলতে লাগল সেই চোর-সর্দার জবর হাতুর।

সে আলো তখন নিভিয়ে দিয়েছে।

ওদিকে বাড়ির ভেতরে আলিবাবা তখন শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

জবরবাহাতুর এইবার চুপি চুপি উঠে পড়ল।

কয়েকবার দাঁত কড়মড় করল। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। চলে গেল সেই খচ্চরগুলোর কাছে। তার সেই বড় বড় জালাগুলো তখন সেখানেই আছে।

চোর-সর্দার জবরবাহাতুর প্রথম জালাটার কাছে ফিসফিস করে বলল,

ওরে আমার চেলা,
এই তো এসেছে প্রতিশোধ নেওয়ার বেলা।
আরো কিছু সময় চলে যাক।
রাত আরো অনেক বেড়ে যাক।
এই বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক।
নাক ডাকা শুরু করুক।
আজগুবি সব স্বপ্ন দেখুক।
ছারপোকার কামড় খেতে থাকুক।

যখন আমি আমার ঐ থাকার জায়গাটা থেকে ছোট ছোট কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ব, তখন তোরা ছোরা ধরে জালা থেকে বেরিয়ে পড়বি। এই বাড়ির কর্তাটাকে দিবি জ্বালা-যন্ত্রণা?—এই হল আমাদের মন্ত্রণা!"

জালার ভিতরের চোরটা ফস্ করে ফিসফিস করে বলে উঠল,—

"এই যে মন্ত্রণা,
এটা তো মন্দ না।"

চোর-সর্দার জবরবাহাতুর তখন সব কয়টা জালার কাছেই গেল। আর ঠিক আগেকার মতোই কথা বলল।

সব কয়টা চোর ঠিক একই রকমে তাদের শয়তান সর্দারটার কথায় সায় দিল।

জবর চোর জবরবাহাদুরের মনে ফুর্তি যেন লাফালাফি করছে। চিংড়িমাছের মতো ছট্‌ফট্‌ করছে। সে চলে গেল তার বিশ্রাম করার জায়গায়। কিন্তু শুয়ে পড়ল না। বসে রইল। তাকে ঘিরে রইল অন্ধকার।

ঐ বাড়ির ভালো মেয়ে মর্জিনা তখনো শুয়ে পড়ে নি। জেগে আছে। পরের দিন সকালে যা কিছু দরকার হবে, তার কিছু কিছু সে তখনই করে রাখছে। আবদুল্লা নামে একটি যুবক ওই বাড়িতে কাজ করে। সেও তখনও জেগেই আছে। রয়েছে সেই মর্জিনার কাছে। সে মর্জিনার কাজে একটু আধটু সাহায্য করছে। ওই সময়ে হঠাৎ একজন চোর বেগে সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের ভিতর গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল।

মর্জিনা বলে উঠল,—"দমকা বাতাসে বাতিটা নিভে গেল। এখন বাতিটা জ্বালিয়ে রাখব কি করে। ঘরে যে একটুও তেল নেই।" আবদুল্লা বলে উঠল,—"ঘরে তেল নেই? কিন্তু বাইরে অনেক তেল আছে।"

মর্জিনা বলে উঠল,—"বাইরে কোথায় তেল?—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আবদুল্লা উত্তর করল,—"আমার কেন মাথা খারাপ হবে।—ঐ এক সদাগর তো তার অনেক তেলের জ্বালা নিয়ে আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছে। তার সবগুলো জালাই তো বাইরে রয়েছে।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা সত্যি বটে, সত্যি বটে। বেশ বুদ্ধি আছে তোমার ঘটে।—যাই, সেই তেলের জালা থেকে একটু তেল এনে এই বাতিটাকে খাওয়াই। তেল খেয়ে বাতির গায়ে তেল হবে। তখন বাতিবাবু বেশ আলো দেওয়ার কাজ করবে।" বলতে বলতে মর্জিনা ঘর থেকে বাইরে চলে গেল। হাতে নিয়ে গেল একটা হাঁড়ি।

আবদুল্লা নিজের শোবার জায়গায় চলে গেল। মর্জিনা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে প্রথম জালাটার কাছে উপস্থিত হল। সেই জালার মধ্যে যে একটা জবর চোর ছিল, সে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মর্জিনাকে দেখে ভাবল,—এই তো আমাদের সর্দার এসেছে। চোরটা ফিসফিস করে বলে উঠল, "এখন কি সময় হয়েছে?"

ঐ কথাটা শোনা মাত্র মর্জিনার সারা শরীর কেঁপে উঠল।

সে বুঝে ফেলল,—ঐ যে লোকটা বলছে সে একজন সদাগর,—আসলে সে মোটেই সদাগর নয়। সে একটা বড় রকমের গুণ্ডা—ডাকাত—খুনী। সে নিশ্চয় খুব ভীষণ কোন ক্ষতি করতে এসেছে। তাই অনেক গুণ্ডা সঙ্গে এনেছে। কাজেই মর্জিনার তখন খুবই সাবধান হওয়া দরকার। মর্জিনাও তখন খুব ফিসফিস করে চোরটাকে বলল,—"না, এখনও সময় হয়নি। সময় শীগ্‌গিরই হবে।"

মর্জিনা তখন পরপর অন্য সব কয়টা চোর-ভরা জালার কাছে গেল।

সব চোরই মর্জিনাকে মনে করল তাদের চোর-সর্দার বলে। তারা একই রকম প্রশ্ন করল। মর্জিনাও একই রকম উত্তর দিল।

সব শেষের জালাটা পরীক্ষা করে মর্জিনা দেখল, সত্যিই সেই জালাটায় তেল রয়েছে। মর্জিনা তখন তার হাতের হাঁড়িটায় অনেকখানি তেল নিয়ে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি করে রান্নাঘরের ভিতরে চলে গেল।

মর্জিনা ভাবল,—আমাদের মনিব আলিবাবা এবং অন্য সকলকে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কি করে তা করা যায়?—অতগুলো গুণ্ডার হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়?

চট করে মর্জিনার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

সে তেলভর্তি হাঁড়িটা চাপাল উনুনের ওপর। অল্পকাল পরেই তেল আগুনের মধ্যে গরম হল।

মর্জিনা তখন সেই হাঁড়িটা নিয়ে চলে গেল বাইরে চোর-ভরা জালাগুলোর কাছে।
মর্জিনা তাড়াতাড়ি করে চোর-ভরা সেই সব জালার ভিতরে সেই গরম তেল খুব করে ঢেলে দিল।
চোরগুলো তখন আর আর্তনাদ করবারও সময় পেল না।
গরম তেল তাদের একেবারে নরম করে দিল। সব কয়টা চোরই অক্কা পেল।
চোরদের সর্দারটার তখন একটু একটু তন্দ্রা এসেছে। সে বসে বসে ঢুলছে।
মর্জিনা এইবার তাড়াতাড়ি করে ঘরের ভিতরে চলে গেল।
সে ভাবল,—এইবার চোরদের ঐ সর্দারটা কি করে, তাই দেখা দরকার। ও-তো আলিবাবাকে করতে চায় ছারখার। তার হাড় করতে চায় চুরমার। ও-তো একটা জানমারা জানোয়ার।
কিছুটা সময় চলে গেল।
চোর-সর্দার জবরবাহাদুরের তন্দ্রা এইবার টুটে গেল, ছুটে গেল।
সে তখন সেই ঘরটার জানালা দিয়ে তার সেই জালাগুলোর ওপর কয়েকটা খুব ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ল। কিন্তু জালার ভিতর থেকে সে কোনই সাড়া পেল না।
তাই সে অস্থির হয়ে উঠল। সে আবার ঢিল ছুঁড়ল।
কিন্তু তবু তার সাথী সেই চোরদের কাছ থেকে কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। সব স্তব্ধ চুপচাপ।সর্দারটা মনে মনে বলে উঠল—বাপ রে বাপ! কোন বিপদ ঘটল নাকি? যাই, বাইরে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার!"
জবরবাহাদুর ঘর থেকে বাইরে চলে গেল তার সেই জালাগুলোর কাছে।
তখন সে তার প্রথম জালা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর দ্বিতীয় জালা পরীক্ষা করল। তারপর পর পর সব জালাই পরীক্ষা করল।
তখন সে দেখল,—আলিবাবাকে জ্বালা দেওয়ার জন্য যারা জালার মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল তারা সবাই আচ্ছা জ্বালা পেয়েছে। তারা জ্বালার চোটে ঝালাপালা হতে হতে শেষ হয়ে গেছে!—গরম তেলে পুড়ে ঝলসে গিয়েছে! চোর-সর্দার তখন বুঝল যে, তার উপরেও টেক্কা দেবার লোক আছে।
চোর-সর্দারটা কি আর তখন সেখানে থাকতে সাহস পায়! তখন সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে—
সেখান থেকে ছুটল—ছুটল—ছুটল!
অন্ধকারের মধ্যে মর্জিনা ঐ ছুটবার শব্দ শুনতে পেল। সে বুঝল, চোর-সর্দারটা বিপদ বুঝে পালিয়ে গেল। মজা-করা মেয়ে মর্জিনা আস্তে আস্তে বলে উঠল,—

পালা, পালা, পালা!
পড়ে রইল তোর জালা!
বলছি মুই,
ভুগবি তুই
আরও কতই জ্বালা!

মর্জিনা তখন মনের সুখে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুম এসে তার চোখ চেপে ধরল। আকাশের চাঁদমুখে কতই হাসি! চাঁদের চারধারে তারাও রাশি রাশি। একটু দূরে কে যেন তখন বাজাচ্ছে বাঁশি। আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে আলিবাবার কাশি!

শেষ হয়ে গেল অনেক চোর! পালিয়েও গেল একটা চোর। তারপর রাতও হয়ে গেল ভোর। আলিবাবার বাড়ির সবাই ঘুম থেকে উঠল। আলিবাবা তখন দেখল, তার সেই রাতের অতিথি সেই সদাগর সেই ঘরের ভিতরে নেই। বাইরেও নেই। আলিবাবা মর্জিনাকে বলল, "আমাদের রাতের অতিথি সেই সর্দারটি গেল কোথায়?"

মর্জিনা বলে উঠল,—"সেই জানোয়ার জঙ্গলে চলে গিয়েছে!—সেই জানোয়ার কি মানুষের মধ্যে থাকতে চায়? সেটা কি মানুষের বাড়ি-ঘরে থাকতে চায়?

আলিবাবা চটে উঠল।—"মর্জিনা, তোমার মুখে এরকম খারাপ কথা কেন?—অতিথির সম্বন্ধে তুমি এমন সব কথা বলছ কেন?"

মর্জিনা বলে উঠলো,—"আপনি তার মুখে দিয়েছেন ভাল ভাল খানা। আর সে আপনার বুকে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল তার ছোরাখানা!—ঐ ওখানে তার জালাগুলো আপনাকে জানিয়ে দেবে আসল ব্যাপারখানা!"

আলিবাবা তখনই ছুটে গেল সেই জালাগুলোর কাছে। মর্জিনাও গেল। আলিবাবা দেখল,—একটা জালা ছাড়া, আর সব কয়টা জালার ভিতরেই রয়েছে মানুষ। এক একটার চেহারা ঠিক অসুরের মত। সব কয়টার সাথেই রয়েছে ভীষণ ছোরা। —কিন্তু ওরা তখন সবাই মরা। মরা!! মরা!!!

আলিবাবার তখন চক্ষুস্থির, আর মন ঘোর অস্থির। মর্জিনা তখন আলিবাবাকে সেই চোরদের আর তাদের সেই সর্দারটার কথা বলল। ঐ সব চোরেরা কিছুদিন আগে আলিবাবার বাড়ির গায়ে খড়ির দাগ কেটে চিহ্ন দিয়েছিল, মর্জিনা সে কথাও বলল। সব শুনে আলিবাবা বলে উঠল,—"মর্জিনা, তুমি আমার মা। না, আমার চৌদ্দ পুরুষের মা, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ! তুমি আর আমার বাড়ির চাকরাণী হয়ে থাকবে না। তুমি থাকবে রাণী হয়ে। সেই ব্যবস্থা আমি অতি শীগ্‌গিরই করব!"

ঐ কথা শুনে মর্জিনার মনেও তখন আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। সে বলে উঠল,—"কিন্তু এই যে জালাগুলোর ভিতরের এই মড়াগুলো, এগুলোকে তো এখনই তাড়াতাড়ি করে গোপনে কবর দেওয়া দরকার!—লোকে জানতে পারলে আমাদের যে ঘোর বিপদ হবে!"

"ঠিক কথা! ঠিক কথা!"—বলে উঠল আলিবাবা।

আলিবাবাদের খুব বড় একটা বাগান ছিল। সেখানে অনেক গাছপালা।

সেই বাগানে তখন খুব লম্বা একটা গর্ত খোঁড়া হল।

সবগুলো মরা চোরকে সেই গর্তের মধ্যে ফেলা হল। মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হল।

পরের জীবন করতে যেয়ে মাটি,
ওরাই হয়ে গেল মাটি।—
ন্যায়ের পথই চিরকালই খাঁটি!

এইসব গুন্‌গুন্‌ করে বলতে লাগল আলিবাবার বাড়ির চাকরাণী সেই মর্জিনা।

আলিবাবা মর্জিনাকে নিজের মেয়ের মতো মনে করে বলল,—"মর্জিনা, তুমি মরণ থেকে আমাদের রক্ষা করেছ! তুমি আমার মা হয়েছ। শীগ্‌গিরই এক শুভদিন আসবে! সেদিন তুমি আমার অতি আদরের জন হয়ে আমার সামনে আসবে। তুমি আমার ঘরে একটি গোলাপ ফুলের মতো আসবে।

ঐ শুনে মর্জিনার মুখে তখন মধুর হাসি।

চোর-সর্দার জবরবাহাদুরের চেলা সেই চোরগুলো সারা জীবন ধরে—
করতে করতে চুরি,
চলে গেল যমপুরী!

চোর-সর্দারটা সেই রাতে লুচি-পুরি পেটের ভিতরে পুরে, শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু তার শয়তানি বুদ্ধিটা গেল না।

কি করে আলিবাবাকে ধ্বংস করা যায়? এই চিন্তায় সে অস্থির হয়ে উঠল।

তার জঙ্গলের সেই আস্তানায় সে পৌঁছে গেল। কিন্তু তার বার বার মনে হতে লাগল, তার চেলা সেই চোরেরা যেন ভূত হয়েছে, তার কাছেই তারা ঘোরাফেরা করছে। তারা যেন তার সাথে কথা বলতে চাইছে।

চোর-সর্দারটা ভূতের ভয়ে বারবার ভড়কে যেতে লাগল। তবু কি তার ভাল ভাব মনে জাগল?

—না, না, না। জাগল না, জাগল না।

আলিবাবা তাকে করেছে সমাদর। কিন্তু সে খুঁড়তে চাইল আলিবাবার কবর। দিতে চাইল আলিবাবাকে কবর। কিন্তু জবরবাহাদুর একটা জবর কুকাজ করতে চাইল। সে আগে ধরেছিল এক রকম ছদ্মবেশ, এবার ধরল আর এক ছদ্মবেশ। সে আবার চলে গেল সেই শহরে। সেই শয়তান সেই শহরে একটা তরাইখানায় জায়গা নিল। সে সারা শহরে ঘোরাফেরা করতে লাগল। আলিবাবার বাড়ির সেই ঘটনা শহরে রটনাও হয়ে গিয়েছে কি না, সে তাই জানতে চাইল। কিন্তু সেই ঘটনার রটনার কোন প্রমাণই সে পেল না। জবরবাহাদুর তখন সেই শহরে এক জায়গায় একটা ঘর ভাড়া করল। সেই ঘরটায় আগে থাকত ভেড়া বা মেড়া। সেই চোরটা এখন সেইটাকেই করল তার ডেরা। সে এইবার লোকের কাছে বলতে লাগল যে, তার নাম খাজা হাসান। জঙ্গলের সেই গুহা থেকে সে অনেক দামী দামী জিনিসপত্র এনে সেই ঘরটায় রাখল। সেই শয়তান সেখানে খুলল একটা দোকান তার ব্যবসা হল লোক ঠকান। সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় কত লোক সেই দোকানে আসতে লাগল।

দোকানে নানা রকম, হরেক-রকম জিনিসপত্র দেখে অনেকেরই তাক লেগে গেল। সেই চোরের দোকানে তখন রয়েছে ঃ

নানা রকম চুড়ি, শাড়ী, নানা রকম গয়না, সোনার শিয়াল, রূপার রুমাল, হীরের গড়া ময়না। আলোয়ান, চাপকান, ঝুমঝুমি রকম রকম পুতুল, ফুল,—মজাদার মজাদার।

ঐ যে চোরের দোকান হল—ঠকের ঐ আস্তানা হল,—ওর উল্টোদিকে রয়েছে আর একটি দোকান। সেইটি আগে ছিল কাশিমের। কিন্তু কাশিম কবরে যাওয়ার পর এখন সেই দোকানটি হয়েছে কাশিমের ছেলের। চোর-সর্দার জানতে পারল, ওই যে যুবকটি দোকান করে, গান করে, বাঁশি বাজায়, ছড়া বানায়, সে হচ্ছে আলিবাবার ভাইয়ের ছেলে। সে কথা জানতে পারার পর থেকেই খাজা হাসান

কাশিমের ছেলের সাথে খুব বেশি করে মেলা-মেশা করতে লাগল। সে প্রায় রোজই তাকে খাওয়াতে লাগল মাংস আর মিঠাই। শোনাতে লাগল মজার মজার গল্প। কাশিমের ছেলেটিও সেই খাজা হাসানের দোকানে ঘন ঘন আসতে লাগল। তার বাবা কাশিম যে কি ভাবে মরেছে, সে কথাও মাঝে মাঝে বলতে লাগল।

একদিন আলিবাবা এল তার সেই ভাইপোয়ের দোকানে। ছদ্মবেশধারী চোর-সর্দারটা তখন সেখানে বসেছিল। আলিবাবাকে দেখা মাত্রই খাজা হাসান তাকে চিনতে পারল। খাজা হাসানের ইচ্ছা হল যে, সে তখনই আলিবাবার বুকে একটা ছোরা মারে। কিন্তু সেই চোরের হাতের কাছে তখন কোন ছোরা ছিল না। তাই আলিবাবা বেঁচে গেল। ছদ্মবেশী খাজা হাসান তখন আলিবাবার সাথে নানা রকম কথা বলল। সে কাশিমের ছেলেকে নিজের ছেলের মতোই ভালবাসে, এমন কথাও সে বলতে ভুলল না। ওর পরে আলিবাবা আরও কয়েকদিন তার ভাইপোয়ের দোকানে এল। একদিন চোর-সর্দারটা আলিবাবাকে খুব আদর দেখিয়ে নিজের দোকানে নিয়ে গেল। তাকে খুব করে খাওয়াল। আর কত রকম মিষ্ট কথাই শোনাল। সেইসব মিষ্ট কথা যে আসলে দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, আলিবাবা তা মোটেই বুঝতে পারল না। সে মনে করল, এই খাজা হাসান লোকটি অতি চমৎকার। এমন লোক এই দেশে মিলবে নাকো আর। সে বুঝল না যে, ঐ ছদ্মবেশে সেই সর্বনেশে।

কাশিমের ছেলে একদিন আলিবাবাকে বলল,—"চাচা, ঐ যে দোকান করে খাজা হাসান, তাকে কি আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা উচিত নয়? খাওয়ানো উচিত নয়?"

—"নিশ্চয় উচিত! একশো বার উচিত!"—বলে উঠল আলিবাবা।

তাহলে, তাকে একদিন আমাদের এই বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করা হোক।—যে লোক ভাল, তাকে তো ভাল করেই সমাদর করা উচিত।

"হ্যাঁ চাচা, কালই তাই করব।" বলল কাশিমের ছেলেটি।

পরের দিন কাশিমের ছেলে চলে গেল খাজা হাসানের দোকানে। খাজা হাসান কাশিমের ছেলেকে দেখেই বলে উঠল, "এস, এস। এস, ভাইপো! তোমাদের সকলেরই খবর বেশ ভাল তো?"

কাশিমের ছেলেটি বলল,—"হ্যাঁ চাচা, সবই ভাল।—তা, আপনার সাথে তো আমাদের মেলা-মেশা অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। আপনি আমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে যাবেন না?"

"কেন যাব না? নিশ্চয়ই যাব!" বলে উঠল সেই গুহার সর্দার।

"তুমি যেদিন আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে সেদিনই আমিই যাব—তোমরা তো আমার একরকম কুটুম্ব হয়ে পড়েছ!" সেই কূট-প্রকৃতির লোকটা বলল, ঐ কুটুম্বিতার কথা।

কাশিমের ছেলে তখন বলল,—"তাহলে চাচা সাহেব আগামী কাল রাত্রে আমাদের বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। যেতে যেন ভুলবেন না।"

"না, না। ভুলব কেন?" খুব আনন্দের ভাব দেখিয়ে বলল সেই চোর-সর্দারটা। সে মনে মনে

বলল,—"কাল ওরা আমাকে খাওয়াবে। ওদের মরণ ঘনিয়েছে। ঐ আলিবাবাকে কাল আমি খুন করব।"

কাশিমের ছেলে তখন তাদের বাড়ির দিকে চলল। সে সেখান থেকে কয়েক পা চলে যাওয়ার পরেই চোর-সর্দার ছদ্মবেশী সেই খাজা হাসান তাকে ডাক দিয়ে বলল,—"ওহে ভাই-পো, আমি কিন্তু তোমাদের বাড়িতে নুন-দেওয়া কোন জিনিষই খাব না। কারণ নুন-মেশানো খাদ্য আমি খাই না।"

ঐ কথা শুনে কাশিমের ছেলে খুবই অবাক্ হল। তবু সে আর কোন কথা না বলে বলল, —"আচ্ছা চাচা, তাই হবে। আপনি যা খাবেন, তাতে নুন মোটেই দেওয়া হবে না।"

কাশিমের ছেলে মোটেই বুঝতে পারল না যে, তার সেই চাচা, এই চোর চাচা, আর আচ্ছা চাচাই বটে। কাশিমের ছেলে তাদের বাড়িতে চলে গেল।

সে আলিবাবাকে বলল,—"চাচা, সেই খাজা হাসানকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি। কাল রাত্রে সে খেতে আসবে।"

আলিবাবা বলল,—"বেশ ভালই করেছ তুমি। খাজা হাসান চমৎকার লোক, তার মনের ভিতরে যেন ভাল ভাবের আলোক। তাকে আদর-অভ্যর্থনা করবার জন্য আমাদের বাড়ি-ঘর একটু সাজাও।"

কাশিমের ছেলে সেইদিনই মর্জিনাকে বলল,—"শহরের বড় ব্যবসায়ী খাজা হাসান কাল রাত্রে আমাদের এখানে খাবে। কিন্তু সে নুন-দেওয়া কোন খাদ্য খায় না। এই কথা আমাকে বলেছে। তাই কাল তুমি যেসব ভাল ভাল জিনিস রান্না করবে, তার কোনটাতেই নুন দিও না।"

মর্জিনা ঐ কথা শুনে খুবই অবাক্ হয়ে গেল।

সে ভাবল, যে লোক নুন-মেশানো খাদ্য খাবে না, সে কি রকম লোক? সে নুন-দেওয়া খাবার কেন খাবে না!

মর্জিনা কিছুই ঠিক করতে পারল না।

সে অবাক্, মনে মনে বলতে লাগল,—যার নুন খাওয়া হবে, তার গুণ গাইতে হবে, তাকে খুন করা চলবে না, তার ক্ষতি করা চলবে না,—এই কথাই তো নাকি জ্ঞানী লোকেরা বলেন। তাহলে ঐ খাজা হাসানই কি সেই চোরদের সর্দার, যে চোরদের জালার ভিতরে ভরে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, আর এই বাড়ির কর্তা আলিবাবার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল? ঐ খাজা হাসান কি এই বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এসে আলিবাবার সর্বনাশ করতে চায়? আর সেইজন্যই কি সে আলিবাবার নুন খেতে চায় না?

যাহোক, কাল যখন সে খেতে আসবে, তখন আমি তার দিকে ভাল করে লক্ষ্য রাখব।—আমি আলিবাবার নুন খাই, তার কাছ থেকে উপকার পাই। তাই আমায় দেখতে হবে তার যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয়।

সে দিনটি গেল। রাতটি গেল। পরের দিনের ভোরবেলাটি এল।

মর্জিনা সারাদিন ধরে অনেকরকম খাবারই খাজা হাসানের জন্য রান্না করল। কিন্তু কোন খাবারের ভিতরেই নুন দিল না।

সেইদিনের দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যাও এসে গেল।

তারপরে এল আঁধার! চোর-সর্দার সেই সময়ে যাত্রা করল আলিবাবার বাড়িতে যাওয়ার জন্য। সে তার জামার ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে চলল একখানা ছোরা। সেই ছোরা যেন এক ভয়ানক দুষ্ট ছোঁড়া!

চোর-সর্দারটার মনটা অতি প্যাঁচালো। সেই প্যাঁচালো লোককে পথে চলতে দেখে কয়েকটা প্যাঁচা বারবার বিকট শব্দ করতে লাগল।

ঐ লোকটার মনে খুব পাপ। তাই ভেবে পথের পাশের ঝোপে-ঝাড়ে সাপ করতে লাগল ফোঁস-ফোঁস।

আকাশে কয়েকটা উল্কাও ছুটতে লাগল।

চোর-সর্দার খাজা হাসান আলিবাবার বাড়িতে পৌঁছে গেল।

সে দেখল, বাড়িখানি খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ময়ূর নাচছে, বাঁশি বাজছে, ফুল হাসছে, আরও কত কি!

খাজা হাসানকে দেখা মাত্র আলিবাবা এগিয়ে এসে সেলাম করে বলল,—"আসুন! আসুন!"

কাশিমের ছেলেও বলল,—"আসুন চাচা, আসুন!"

খাজা হাসান ঐ দুজনকে সেলাম করল।

ওরা দু'জনে তখন খাজা হাসানকে খুব করে সাজানো একটা ঘরের ভিতর নিয়ে বসাল। একটি চাকর খাজা হাসানকে হাওয়া করতে লাগল। আর একজন গোলাপ-জল ছিটাতে লাগল।

তারপর হল ভোজনের আয়োজন। কতরকম খাবারই যে সেখানে হাজির হল: তার নাম বলতে গেলে আমাদের ঘাম ছুটে যাবে।

চোর-সর্দারটা আলিবাবাকে বলল,—"আমি যা-কিছু খাব তা সবই বিনানুনে রান্না করা হয়েছে তো?"

আলিবাবা বলল,—"নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

তখন হাওয়া খেতে খেতে খাদ্য খাওয়াও শুরু হল।

মর্জিনা তখন খাজা হাসানকে ভাল করে দেখে বেশ বুঝতে পারল যে, ঐ খাজা হাসানই সেই কিছুদিন আগেকার রাতের সেই তেল-ব্যবসায়ী চোর-সর্দার।

মর্জিনা মনে মনে বলল,—"এই চোর-সর্দ্দারটা আলিবাবাকে খুন করতে এসেছে, কিন্তু আমি ওকে আর্তনাদ করিয়ে ছাড়ব! ওর শয়তানি আমি ভাল করে ছাড়িয়ে দেব।"

আলিবাবা আর কাশিমের ছেলের খাওয়া শেষ হল। খাজা হাসানেরও গেলা শেষ হল।

আলিবাবা তখন খাজা হাসানকে বলল,—"এখন একটু গান শুনবেন না?"

খাজা হাসান হেসে হেসে বলে ফেলল,—হ্যাঁ, খানা হল, এখন তো গানা গানই চাই!"

মর্জিনা মনে মনে বলল,—"গানের পরে হানা—বুকে ছোরা হানা!"

আলিবাবা তখন মর্জিনাকে বলল,—তুমি এখন আমাদের এই অতিথিকে একটু গান শোনাও!"

মর্জিনা বলল,— "হ্যাঁ, নিশ্চয় শোনাব। আমি আসছি এখনই!" এই বলে সে ভিতরে চলে গেল। তারপর নাচ-গানের পোশাক পরল। আর জামার ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে নিল একখানা ছোরা।

সে তখন আলিবাবার

চাকর আবদুল্লাকে বলল,—তুমিও নাচ-গানের পোশাক পর। একটা তম্বুরা বা খঞ্জরি নাও। আমি নাচব ও গাইব, তুমি বাজাবে আর সভা মজাবে।"

আবদুল্লা বলল,—"তা বেশ হবে, বেশ হবে।"

আবদুল্লা পোশাক পরল। তম্বুরা ধরল।

মর্জিনা আর আবদুল্লা তখন এসে গেল সেই ভোজের জায়গায়।

মর্জিনা আর আবদুল্লাকে দেখে চোর-সর্দারটার মনে হল, ওরা যেন কিন্নরী আর কিন্নর—বিদ্যাধরী আর বিদ্যাধর! শুরু হল—নাচ, গান, বাজনা!

মর্জিনার মুখ গান গায়, তার পা কত রকমে নড়েচড়ে—কসরত করে—অর্থাৎ নাচে। তার হাতও কতরকম ভঙ্গী করে, তার পায়ে নূপুর বাজে—রুনুঝুনু-রুনুঝুনু!

"ওঃ, আজ কি আনন্দ পেলাম! কি আনন্দ পেলাম!" আলিবাবার দিকে চেয়ে বলে উঠল সেই চোর-সর্দার। তখন আবদুল্লার তম্বুরার বাজনার বহরও কম নয়!

তার তম্বুরা বারবার তার হাতের চড়-চাপড় খায়, আর শব্দ ক'রে ক'রে তাক লাগায়! নাচতে নাচতে হঠাৎ মর্জিনা ফস করে তার ছোরাটা বার করল। সেইটা নানারকম ভঙ্গী করে ঘোরাতে লাগল।

চোর সর্দারটা তখন মনে মনে বলে উঠল,—একটু পরেই আমিও আমার ছোরা বার করব। এখন আলিবাবা ঐ ছোরার ভঙ্গী দেখে ফুর্তিবোধ করছে; কিন্তু আমার ছোরার ভঙ্গী তার বুকের হাড় ভেঙ্গে দেবে।

মর্জিনাও ঐ সময়ে মনে মনে বলল,—"ওহে চোর-সর্দার খাজা হাসান! এখন তুমি আমার এই ছোরার ভাব-ভঙ্গী দেখে ফুর্তিবোধ করছ! কিন্তু একটু পরেই তুমি আমার এই ছোরার আর একরকম ভঙ্গী দেখবে! তখন তোমার ফুর্তি ফুরিয়ে যাবে!"

যারা কোন সভায় নাচে আর গায়, তারা তখন সেই সভার লোকদের কাছ থেকে বকশিশ চায়। এইরকম প্রথা চালু আছে দেখা যায়।

মর্জিনাও তখনও নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বকশিশ চাওয়ার ভঙ্গী করে আলিবাবার সামনে একটা সোনার বাটি ধরল।

আলিবাবাও সেই বাটিতে একটি মোহর দিয়ে দিল।

মর্জিনা তখন কাশিমের ছেলের সামনেও বাটি ধরল!

কাশিমের ছেলে তখন একটি সোনার মোহর সেই সোনার বাটির মধ্যে দিল।

এইবার মর্জিনা তার সেই বাটিটা ধরল খাজা হাসানের সামনে।

খাজা হাসান তখন তার জামার ভিতর থেকে তার মোহরের থলি বার করবার জন্য জামার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল।

আর ঠিক তখনই মর্জিনা তার ছোরাটা চালিয়ে দিল, ঢুকিয়ে দিল খাজা হাসানের বুকের ভিতরে। খাজা হাসানের মুখ থেকে আর্তনাদ উঠল। তার বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। আলিবাবা 'হায়-হায়' করে উঠল,—"একি করলে মর্জিনা, একি করলে। আমাদের অতিথিকে কেন খুন করলে?"

মর্জিনা তখন খাজা হাসানের জামায় একটা টান মারল। তার ভিতর থেকে তার ছোরাটা বার করল। সেইটা আলিবাবাকে দেখিয়ে বলে উঠল,—"এটার জন্য এটাকে খুন করলুম। এই দস্যুটা এই ছোরাটা আপনার বুকে বসাবার জন্য ওর জামার ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল—এখন আপনি তা বুঝতে পারছেন তো?"

তখন খাজা হাসানের মুখ থেকে কাতর শব্দ বেরুতে লাগল,—"আলিবাবা সাহেব, আমি সেই ধন-রত্নের গুহার মালিক চোরদের সর্দার জবরবাহাদুর। আমি একদিন রাতের বেলায় তেল-ব্যবসায়ী সেজে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলুম। আজও তোমাকে খুন করবার জন্যই এসেছিলুম। কিন্তু নিজেই খুন হয়ে গেলুম! মারতে এসে মার খেলুম!"

চোর-সর্দারটার প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

চোর-সর্দারটার ছোরা-মারা থেকে আলিবাবা বেঁচে গল। পূর্বেও সে একবার বেঁচে গিয়েছে। সেইবার আর এইবার, এই দু'বারই মর্জিনাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আলিবাবা তাই আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল।

সে বারবার বলতে লাগল,—"মর্জিনা, তুমিই আমাকে বাঁচালে। তুমিই আমাকে ঐ রাক্ষসের মতো মানুষটার হাত থেকে রক্ষা করলে। তুমি সুখী হও। সুখী হও।"

বুদ্ধিমতী মর্জিনা বলে উঠল,—"আমি কি করে সুখী হব?" আমি যে আপনার একজন দাসী। পরের বাড়ীর কোন দাসী সুখী হতে পারে? আপনিই বলুন না।"

"আমি তোমাকে তোমার দাসীগিরি থেকে এখনই মুক্তি দিলুম!" আদন্দের আবেগে বলে উঠল আলিবাবা।

—"তুমি এখন থেকেই মুক্ত হলে। স্বাধীন হলে। ঈশ্বর তোমার ভাল করুন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি।" বলতে বলতে আলিবাবা মর্জিনার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল।

তারপর আবার বলল,—"মর্জিনা, তুমি এতদিন আমাদের এই বাড়ির চাকরাণী হয়ে এসেছিলে। এইবার এই বাড়ির রাণী হয়ে সারা জীবন এই বাড়িতে তুমি থাকবে, আমি তাই করব।"

সঙ্গে সঙ্গেই সে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল,—"ওরে, তোরা বাদ্য বাজা। বাদ্য বাজা।"

আবদুল্লা তখনই তার তম্বুরা বাজাতে শুরু করল।

বাড়ির অন্য কয়েকজন চাকরও নানারকম বাদ্য নিয়ে এসে খুব করে বাজাতে লাগল।

রাত যখন অনেক হয়ে গেল, তখন তারা চোর-সর্দারটার মৃতদেহটা বাড়ির একটা বাগানের ভিতর নিয়ে গেল।

সেখানে বড় একটা গর্ত খোঁড়া হল। সেই গর্তের ভিতরে সেই মৃতদেহটা নামিয়ে দেওয়া হল। চোর-সর্দারকে কবর দেওয়া হল।

ঐ কাজটা করা হল খুবই গোপনে। বাইরের কোন লোকই তা জানতে পারল না।

তারপর চলে গেল রাত। এত প্রভাত।

সেই চোরটা—সেই গুণ্ডাটা—সেই বদ লোকটা বধ হয়ে গেল।

আলিবাবা তখন মর্জিনাকে তাদের বাড়ির বউ করতে চাইল। সে তার ভাই-পো কাশিমের ছেলেকে বলল,—"বাছা, আমি তোমার সাথে মর্জিনার বিয়ে দিতে চাই।"

কাশিমের ছেলে ওই কথা শুনে খুবই খুশী হল। তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল বিয়ের আয়োজন। একটি শুভদিনে সেই বিয়েটি হয়ে গেল।

গরীবের মেয়ে মর্জিনা এতদিন ধরে ভাল কাজ করেছে। ভাল ভাব মনের ভিতরে রেখেছে, তাই এখন থেকে তার চিরসুখের আরম্ভ হয়ে গেল। সেই চাকরাণী হল রাণী। মর্জিনা হল সকলেরই মনের মতো।

তাদের সেই বিয়েতে খানা-পিনা, নাচ-গান-বাজনা কতই হল। আর কত গরীব লোককে কত কিছুই দান করা হল। ওর পরে আলিবাবা মর্জিনাকে আর কাশিমের ছেলেকে একদিন নিয়ে গেল সেই মণি-মাণিকের গুহায়। তাদের সাথে গাধাও গেল অনেকগুলো।

তারা সেই গুহা থেকে সব ধন-রত্ন বের করে নিয়ে এল তাদের বাড়িতে। সেইসব রেখে দিল কয়েক হাজার হাঁড়িতে।

দিনে রবি আর রাতে চাঁদের মতো সুখ আর শান্তিতে ভরে রইল আলিবাবার বাড়ি।

আলিবাবা ও চল্লিশ চোর

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিবাবা ও চল্লিশ চোর

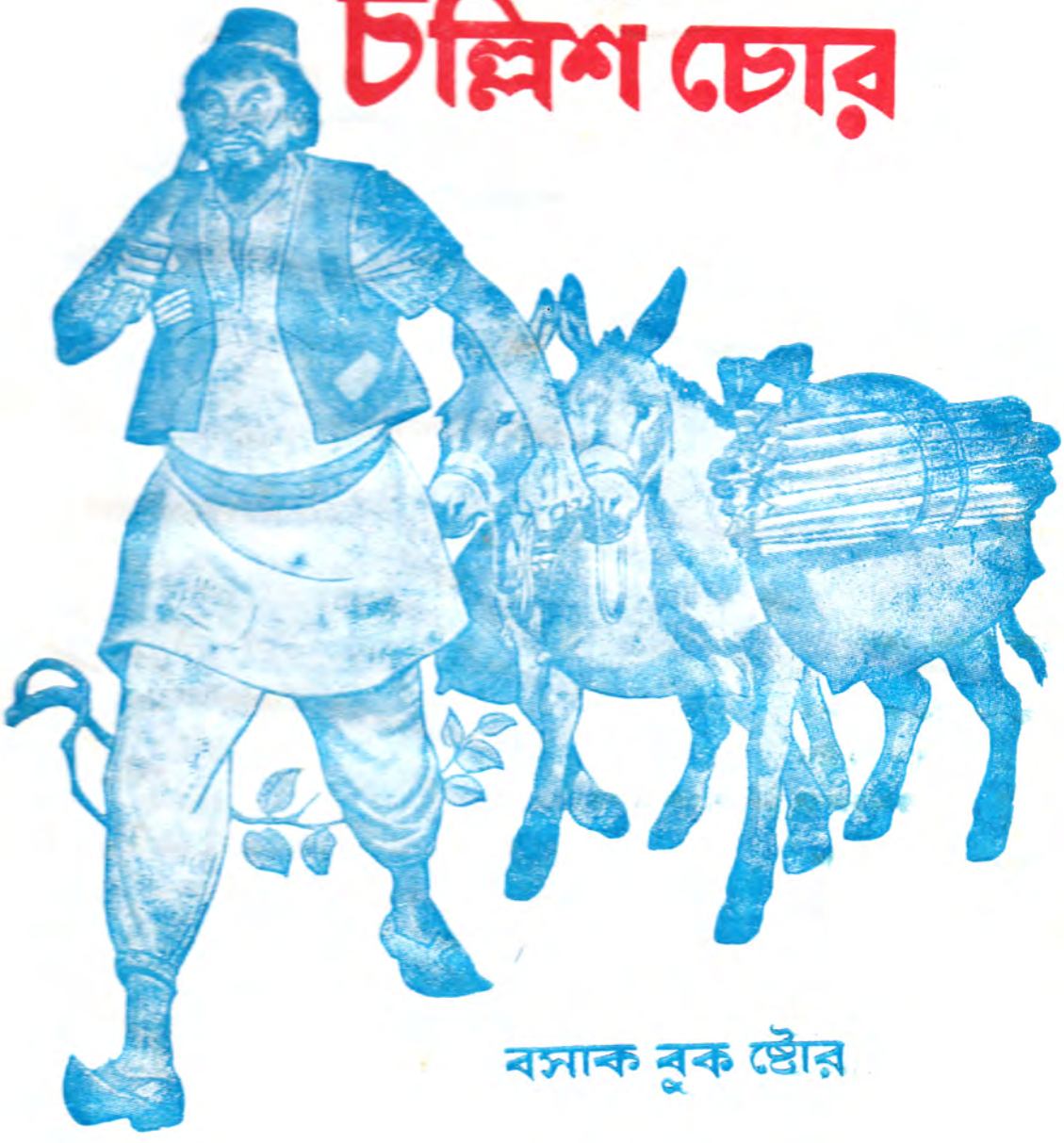

বসাক বুক ষ্টোর

আলিবাবা ও চল্লিশ চোর